স্মৃতির পাখিরা সুধীন্দ্রনাথ পর্যায়

সুরজিৎ দাশগুপ্ত

(বৈশাখ - আষাঢ় ১৪১০ দশম বর্ষ ১ম সংখ্যার পর থেকে)

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসে ভর্তি হয়ে মাসখানেক ক্লাস করে পুজোর ছুটিতে জলপাইগুড়িতে গিয়ে জলার্ক পুজো সংখ্যা বের করেই এমন অসুস্থ হয়ে পড়ি যে একেবারে শয্যাশায়ী ও গৃহবন্দী। যেসব বন্ধুরা দেখতে আসত তাদের মধ্যে কমলেশ চক্রবর্তীই আমাকে প্রথম জানায় যে কলকাতা বেতার কেন্দ্রে একটা বিশাল কবি-সম্মেলন হবে। রবীন্দ্র প্রভাবিত অনেক কবির সঙ্গে জীবনানন্দ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুধীন্দ্রনাথ প্রমুখও কবিতা পড়বেন। বোধহয়১২ অক্টোবর তারিখে জীবনানন্দের ১০ তারিখে লেখা একটা চিঠি পাই। সেই ঐতিহাসিক কবি সম্মেলন হয় ১৩অক্টোবর। প্রিয় কবিদের কণ্ঠস্বর শোনার জন্য উদগ্রীব ছিলাম। তাতে অবশ্য প্রেমেন্দ্র মিত্র শেষ পর্যন্ত যোগ দেননি। কিন্তু জীবনানন্দ ও সুধীন্দ্রনাথের গলা শুনেই আমি আনন্দে আটখানা। পরদিন সকালেই বিছানায় বসে তাঁদের চিঠি দিলাম। তখন কে জানত যে সেদিন বিকেলেই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় জীবনানন্দের বিখ্যাত পথ চলার শেষ হবে। স্বভাবতই তাঁর কাছ থেকে আর কোনও চিঠি পাইনি প্রেমেন্দ্রর কাছ থেকেও। তিনি অবশ্য কমই চিঠির জবাব দিতেন, পত্রপাঠ কদাচ নয়, কিন্তু যখন দিতেন তখন তাতে থাকত একটা অন্তরঙ্গ সুরের বিস্তার। অবশ্য সুধীন্দ্রনাথের কাছ থেকে পত্রপাঠ উত্তর পেলাম।

৬নং সুইট, ৬ রাসেল স্ট্রীট্, কলিকাতা - ১৬
প্রিয়বরেষু,
তোমার চিঠি পেয়ে যদিও খুশী হয়েছি, তবু তুমি অসুস্থ জেনে খুবই খারাপ লাগল। অল্প বয়সে ছ মাস সময় এমন কিছু নয়, এবং সে-সময় বাড়ি ব'সে থাকলেও, তুমি নষ্ট করবে না তা আমি জানি। তবু রোগভোগ অল্প বয়সেই দুঃসহ, এবং আজকের দিনে অনাবশ্যকও হওয়া উচিত। যাই হোক, আশা করি আগামী বারের পরীক্ষায় কারণ ধরা পড়বে, এবং তার পরে যথোচিত চিকিৎসার ত্রুটি হবে না।
সে দিনের কবিতাপাঠ তোমার পছন্দ হয়েছে শুনে উল্লসিত হয়েছি। বেতারের কর্তৃপক্ষ চেয়েছিলেন যে অপ্রকাশিত কবিতা পড়ি। অপ্রকাশিত মূল কবিতা হাতে ছিল না বলে অনুবাদই পড়তে হলো। আত্মপরিচয় নামক শেষ অনুবাদটার আদিপুষ হাইনে---তুমি ঠিকই শুনেছিলে। অন্য দুটো গ্যেটে অবলম্বনে লেখা। তিনটেই আমার আগামী বই 'প্রতিধ্বনি'-তে থাকবে। সে-বই আর মাসখানেকে বেরিয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু আধুনিক কালে যা উচিত, তা বিরল।
"জলার্ক" এখনও পাইনি, আজ - কালের মধ্যে নিশ্চয়ই আসবে। এ - বারে শারদীয়া পাঁচ - ছখানা কাগজে আমার কিছু লেখা আছে, কিন্তু এক আনন্দবাজার ছাড়া বাকি অনুবাদ।

ইতি ১৬ অক্টোবর ১৯৫৪
তোমাদের

নাম সই করার আগে যে 'তোমাদের' কথাটা লিখেছেন এটা লক্ষণীয়। বোঝাই যাচ্ছে যে সুধীন্দ্রনাথ আভিজাত্যের নির্মো াক থেকে বেরিয়ে এসে অন্তরঙ্গ স্তরে নতুন প্রজন্মের সঙ্গে মিলতে চাইছিলেন। এই চিঠি থেকে এটাও জানা যাচ্ছে তিনি তখন বিভিন্ন বিদেশী কবির কবিতা অবলম্বনে কবিতা লেখায় অথবা সেভাবে লেখা কবিতাগুলির প্রচারে নিজেকে নিযুক্ত করেছিলেন। প্রেরণা - তাড়িত হয়ে কবিতা লেখায় তিনি বিশ্বাস করতেন না। কিন্তু আপন রচনার অনুকূল এক প্রকার ম ানসিক পরিস্থিতি নির্মাণ করার জন্য তখন তিনি এক এক প্রকার কাব্য অনুশীলনে ব্যাপৃত যাকে আমরা অনেক সময় অনুব াদ কর্ম বলে উল্লেখ করি, প্রেরণাকে তিনি ১৯৫৩-র ৩১ মে রচিত 'সংবর্ত'রভূমিকাতে বলেছেন 'দায়িত্বহীনতা'র নামান্তর এবং দুমাস পরে 'অর্কেস্ট্রা'র নতুন সংস্করণের ভূমিকাতে বলেন, 'প্রেরণার মতো অভিজ্ঞতাও উপাত্তমাত্র' এবং আপন বক্তব্যকে ব্যাখ্যা করে লেখেন, 'শিল্প - সামগ্রীর উপাদান যদিও সনাতন ও সর্বজনীন সংসারেই আহরণীয়, তবু যে অসাম ান্য বিন্যাসে সেই চিরাচরিত উপকরণ সমূহ আমাদের বিস্ময়জাগায়, তার উৎপত্তি শিল্পীর একাগ্র সংকল্পে।' এবং এই সংকল্প থেকেই তিনি তখন কবিতা লেখার কোনও অবলম্বন নিজের ভেতর থেকে না পেয়ে বাইরের বিদেশী কবিদের কাছ থেকে ঋণ করেন।

'প্রতিধবনি' প্রকাশের জন্য আগেই যে সুধীন্দ্রনাথ পাণ্ডুলিপি সম্পূর্ণ প্রস্তুত করে সিগনেট প্রেসকে দিয়েছিলেন তা বইটির ভূমিকা রচনার তারিখটা খেয়াল করলেই বোঝা যায়। ওই তারিখটা হল ১১ জুলাই ১৯৫৪, কিন্তু বইটির ভেতরে প্রক াশের তারিখ ফাল্গুন ১৩৬১ পাতা হয়েছে। তাঁর মানে ফেব্রুয়ারি - মার্চ ১৯৫৫, আমাকে তিনি জলপাইগুড়িতে যে কপিটি উপহার পাঠিয়েছিলেন তাতে ৬.৪.৫৫ তারিখ দিয়ে নাম সই করেছিলেন। পৃথিবীর অনেক মহান কবির অলোকস ামান্য প্রতিভা যে দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয়েছে সেই দর্পণটি হল সুধীন্দ্রনাথ দত্তর 'প্রতিধবনি' নামে বাংলার এক অনবদ্য উজ্জ্বল মনন।

জলপাইগুড়িতে অক্টোবরের শেষাশেষি শীত পড়ে যায়। ওষুধ - বিষুধ, ক্যালসিয়ম ও ভিটামিন, তার সঙ্গেপুষ্টিকর খাওয় াদাওয়া আর যথেষ্ট বিশ্রাম এবং আবহাওয়ার উন্নতির ফলে আমি নভেম্বরের মধ্যে বাড়ির বাইরে বার হবার মতো গ ায়ের জোর পেলাম। শহরের একমাত্র এক্স্-রে মেসিনটা তখনও খারাপ। শরীরের কতকগুলি লক্ষণ দেখে এক রকম অ ান্দাজেই যক্ষ্মার চিকিৎসা চলছিল। বাড়ি থেকে প্রথম বেরোই জলপাইগুড়ির টাউন ক্লাবের ফুটবল মাঠে ভারতের প্রথম র াষ্ট্রপতি বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের জনসভাতে। স্বাধীনতা লাভ, প্রথম রাষ্ট্রপতি, প্রথম নির্বাচন, প্রথম সংসদ এসবের তখন একট া বিশেষ আকর্ষণ ছিল। ওই সভাতেই যখন যেতে পারলাম তখন রোগ নির্ণয়ের ও বড় চিকিৎসকের ব্যবস্থাদির জন্য কলক াতাতেও যেতে পারি।

কলকাতাতে এসে মা উঠলেন নির্জাপুর স্ট্রিটের একটা হোটেলে। কাছেই ছিল চিন্তামণি দাস লেনে সুখরঞ্জনদার মেস যেখ ানে আমি শান্তিনিকেতন থেকে এসে প্রায়ই উঠতাম। এবার ইচ্ছেমতো বেরোনো বারণ। তাই এসেই জীবনানন্দ, প্রেমেন্দ্র, সুধীন্দ্রনাথ, সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখকে চিঠি দিয়ে আমার আসার খবর জানালাম। চিঠি পেয়ে সুভাষদা একেবারে হো াটেলে এসে হাজির । তাঁর মুখেই প্রথম জীবননান্দের মৃত্যু - সংবাদ শুনলাম। পরে জানলাম যে মা আগেই জানতেন, বন্ধুদের খবরটা আমাকে জানাতে বারণ করে দিয়েছিলেন। আমার অসুখটা যে যক্ষ্মা তা গোড়াতেই জলপাইগুড়ির ডাক্ত াররা সন্দেহ করেছিলেন, সেই সন্দেহটাই সত্য প্রমাণিত হল কলকাতায় এসে। মায়ের বন্ধু ড. অণকুমার নন্দী বুঝিয়ে দিলেন যে গির নাড়াচাড়ায় যক্ষ্মার জীবাণু আরও শক্তি পায় যেমন মটর গাড়ি চললে ব্যাটারি আপনা থেকে চার্জিং হয়, তাই যক্ষ্মার গি যত কম চলাচল করে ততই ভালো। অথচ সুভাষের মুখে জীবনানন্দের খবরটা পাওয়ার পর থেকে আমার মাথায় ঘুরছিল যখন জীবনানন্দের বাড়িতে যাওয়ার আর কোনও অর্থ নেই তখন অন্তত 'জলার্ক'-র জীবনানন্দ সংখ্যা বের করার চিন্তা।

ফিরে এলাম জলপাইগুড়িতে। কার্তিক লাহিড়িকে বললাম 'জলার্ক'-র জীবনানন্দ সংখ্যা বের করার ব্যাপারে সাহায্য করতে। আমি ঘরে বসে থাকলেও কার্তিকের আর সোমনাথের দৌলতে নভেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে সংখ্যাটি বেরিয়ে গেল। সেইটেই জীবনানন্দের উপর কোনও পত্রিকার প্রথম বিশেষ সংখ্যা। তাতে আমিই বোধহয় প্রথম তাঁকে 'আধুনিকক

ালের বিশিষ্টতম কবি' বলে চিহ্নিত করি। অর্থাৎ অন্যতম বিশিষ্ট বা বিখ্যাত কবি নন, তিনিই বিশিষ্টতম। যে গতিতে সংখ্যাটি প্রকাশ করা হয় সেই গতিতে সংখ্যাটি গ্রাহকদের ও কলকাতার অন্যান্য পত্রপত্রিকায় পাঠানো সম্ভব হয়নি, কারণ প্যাকেট করা, ডাক টিকিট কিনে আনা ও লাগানো, পোস্টঅপিসে নিয়ে যাওয়া ইত্যাদি কাজ করার জন্য লোকাভাব। যতদূর মনে পড়ে এসব কাজ কমলেশই করেছিল আমার অসুখের ছোঁয়াচের পরোয়া না করে অথচ সে 'জলার্ক'-র সঙ্গে জড়িত ছিল না। জীবনানন্দ সংখ্যার ধকল সবে শেষ হয়েছে এমন সময় কলকাতার হোটেল থেকে ঠিকানা কাটা হয়ে সুধীন্দ্রনাথের চিঠি এল জলপাইগুড়ির ঠিকানায়। তিনি লিখেছিলেন,

তোমার চিঠি যথাসময়ে পেয়েছি। কিন্তু গত কয়েক মাস অত্যন্ত ব্যস্ত আছি গোটা কয়েক নতুন কাজ নিয়ে, এবং শরীরটাও খুব ভালো যাচ্ছে না। সেই জন্যে আগের পত্রগুলোর জবাব দিতে পারিনি; অপরাধ নিও না।

তোমার ঠিকানা দেখে বুঝলাম তুমি এখন কলকাতায়। স্বাস্থ্য কেমন ? বাড়ি থেকে বেরোও কি? যদি ঘুরে বেড়ানোর অনুমতি পেয়ে থাকো, তা হলে সামনের সপ্তাহে পাঁচটা নাগাৎ কোনও এক দিন আমাদের ওখানে এসো। সাক্ষাতে কথা হবে।

ইতি ১৪ ডিসেম্বর ১৯৫৪

ভবদীয়

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

কমলেশ চক্রবর্তী তখন জলপাইগুড়ির কলেজে পড়ছে। আমার বন্ধুরা হয় কেউ কলকাতায় পড়ছে, নয় এখানে ওখানে চাকরির খোঁজে ব্যস্ত। কমলেশ প্রায়ই বলত যে জলপাইগুড়ির আবহাওয়ায় সে হাঁপিয়ে উঠছে। একটা ভালো লাইব্রেরি নেই যেখানে আধুনিক বাংলা কবিতা পাওয়া যায়, ভরসা শুধু কলেজ লাইব্রেরি, সেখানেও জীবনানন্দ সুধীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেব বসু বিষ্ণু দে প্রমুখের নতুন বই নেই, 'কবিতা' পত্রিকা আসে, কিন্তু 'চতুরঙ্গ' কি 'সাহিত্যপত্র' আসে না আধুনিক ইউরোপীয় অথবা মার্কিন সাহিত্য তো আরও নেই। কলকাতায় একটা চাকরি বাকরি পেলে কলকাতায় থাকার আর কলেজে পড়ার দুটোর খরচ উঠবে একই সঙ্গে। আর সেই সঙ্গে হাতে গরম আধুনিক সাহিত্যও পাওয়া যাবে। সুধীন্দ্রনাথের চিঠিটা পড়ে কমলেশ বলল, যে নতুন কাজের কথা লিখেছেন সেটা বোধহয় বিড়লাদের কোনও কোম্পানি, সেখানে তিনি ওকে একটা কাজ দিতে পারেন কি না জিজ্ঞেস করতে। সুধীন্দ্রনাথকে উত্তর দেওয়ার সময় প্রথমেই কমলেশের কথা লিখলাম না। প্রথমে কলকাতার ডাক্তার আমাকে কী বলেছেন তা জানিয়ে পুজো সংখ্যার আনন্দবাজারে প্রকাশিত প্রতীক্ষা কবিতাটি সম্বন্ধে দু -চার কথা লিখে সব শেষে যোগ করলাম কমলেশের প্রসঙ্গ। নতুন বছরের প্রথম সপ্তাহেই তাঁর উত্তর পেলাম। লিখেছেন,

তোমার চিঠি পেয়ে ভাবিত হলুম। এখনও তোমার শরীর ঠিক হয়নি। জেনে খারাপ লাগছে। তবে রোগেরবিদ্ধে ধৈর্যধারণ করা ছাড়া উপায় কি? জলপাইগুড়ির আবহাওয়া শুনেছি স্বাস্থ্যকর, এবং এখন সময় তো অনুকূল। তোমার বয়সে আমিও অনেক দিন অসুস্থ ছিলুম, তখন যা পড়াশুনো করতে পেরেছি। যাই হোক, সাবধানে থেকো, এবং যথাসত্বর সেরে ওঠো।

নিজের কবিতা - সম্বন্ধে কী আর বলব। তার উৎকর্ষ - অপকর্ষ আমার মতামতের অপেক্ষা রাখে না। তোমার যদি ভালো না লাগে, তাহলে সে জন্য লেখাই দায়, ভালো লাগলে তাকে একেবারে নির্গুণ বলা যাবে না।

আমি বির্লাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নই। উপস্থিত আমাদের এক বিশেষ বন্ধু ইণ্ডিয়ান্ ইন্‌স্টিট্যুট অফ্ পাব্লিক অপিনিয়ন নামে একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্থাপনা করে, আমাকে তার কলকাতা শাখার কর্তা হিসাবে বাহাল করেছেন। এখনও কাজ ঠিক করে শু করা যায়নি। এখনকার মতো আমাদের যে লোকের দরকার তা কিন্তু নেওয়া হয়ে গেছে মাস ছয়েকের আগে আর লোক দরকার হবে বলে মনে হয় না।

''প্রতিধবনি'' কবে বেরোবে তা বলা শত্ত, 'স্বগত'-র দ্বিতীয় সংস্করণের জন্যে এখনও কোনও আয়োজন করিনি।

ইতি ৩রা জানুয়ারী ১৯৫৫

ভবদীয়

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

'প্রতীক্ষা' সম্বন্ধে ঠিক কী লিখেছিলাম তা এতদিন পরে আর মনে নেই। তবে তেমন বিরূপ বিচার করার কথা নয়। বোধহয় যা বলতে চেয়েছিলাম তা ঠিক বলা হয়নি। আবার অন্য রকমও হতে পারে। 'প্রতীক্ষা' ছিল তাঁর নতুন পর্যায়ের প্রথম কবিতা, তার পরে ন-টি কবিতা নিয়েই এই পর্যায়ের দশটি কবিতা পরে 'দশমী' নামে বেরোয়। এই পর্যায়ের প্রথম কবিতা টি বিচ্ছিন্নভাবে পড়ে যথার্থ পরিপ্রেক্ষিতে সেটার ব্যঞ্জনা ধরতে পারিনি এমনও হতে পারে। এই চিঠি পেয়েই 'প্রতীক্ষা' সম্ বন্ধে আমার চিন্তা আর একবার ব্যাখ্যা করে এবং এর অব্যবহিত আগের কাব্য 'সংবর্ত সম্বন্ধে আমার উপলব্ধি সংক্ষেপে জ ানিয়ে তাঁকে একটা চিঠি দিলাম।

আমার সেই চিঠির উত্তর পাওয়ার সময় হবার আগেই যা হল তার কথা বলি। তারিখটা মনে নেই, শুধু মনে আছে সেটা ছিল জলপাইগুড়ির জাঁকানো শীতের এক সন্ধ্যা। বিকেলের বন্ধুরা যে যার বাড়ি ফিরে গেছে। মা গেছেন কোথাও গি দেখতে। কাজের মেয়ে দুজন বোধহয় রান্নার জায়গায় আগুন পোয়াচ্ছে। রেডিয়োটা চালিয়ে রেখে আমি একা বিছানায় শুয়ে, পাশের টুলে কাঁসার বাটি ও চামচ রাখা আছে যাতে দরকার হলে সে দুটো বাজিয়ে সাহায্য চাইতে পারি। মাথার দিকে জানালার বাইরে রাস্তার শব্দটব্দ যেন শীতে জবুথবু মেরে পড়ছে ঘরের তরল অন্ধকারে। নিজের নয়, রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি। 'মহুয়া' কাব্যগ্রন্থ থেকে প্রথমে 'সুন্দরী, তুমি শুকতারা', তার পরে 'যেথায় তুমি গুণী জ্ঞানী' কবিতাটি। শেষে যখন বললেন, 'দেখবে আমায় স্বপন দেখা চোখে/ চমকে উঠে বলবে তুমি, ও কে, / কোন্ দেবতার ছিল মানসলোকে / এল আমার গানের ডাকে ডাকে...../' তখন গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। মনে পড়ল অনেকদিন আগে প্রেমেন্দ্র মিত্র বলেছিলেন যে সুধীন্দ্রনাথ অসাধারণ আবৃত্তিও করেন এবং রঙ্গমঞ্চে গেলে তিনি ও শিশির ভাদুড়ীর মতো খ্যাতি পেতেন। এখানে একটা স্বকৃত ভুল শুধরে দিতে চাই। আগে এক জায়গায় লিখেছি যে বাহান্ন সালের বসন্তকালে সুধীন্দ্রনাথ রেডিয়োতে রবীন্দ্রনাথেৰ কবিতা পড়েছিলেন। আসলে তিনি নিজেরই কবিতা পড়েছিলেন, সম্ভবত 'উটপাখী' আর অন্য ছন্দের কোনও একটি কবিতা, কিংবা শুধুই 'উটপাখী'। এতদিন পরে সব ঠিক - ঠিক মনে নেই। রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়লেন ১৯৫৫-র ২৪ জানুয়ারি।

পরদিন সকালে উঠেই তাঁকে চিঠি লিখলাম। কী করে ডাকে দেব ভাবছিলাম। কমলেশ এসে হাজির। আগের দিন সে-ও সুধীন্দ্রনাথের অপূর্ব আবৃত্তি শুনেছে। ডাকবাক্সে ফেলার জন্য তার হাতেই দিলাম চিঠিটা। তাতে তাঁর আবৃত্তি সম্বন্ধে আম ার মনের আলোড়ন জানিয়েছিলাম। এবার তাঁর উত্তর এল পত্রপাঠ। সেই চিঠিই হল---

THE INDIAN INSTITUTE OF PUBLIC OPINION
HEAD OFFICE: 52, QUEENSWAY, NEW DELHI- 1
DIRECTOR FOR WEST BENGAL SESLIE HOUSE
SUDHINDRANATH DATTA 19A CHOWRINGHEE. CALCUTTA 13

প্রিয়বরেষু,

তোমার ২৫ তারিখের চিঠি কাল পেলুম। তার আগের পত্রও যথাসময়ে এসেছিল, কিন্তু উল্লিখিতপ্রতিষ্ঠানের উপক্রমণিকা এত শক্ত যে অন্য কিছু করার জন্য মোটে অবকাশ পাচ্ছি না। তাই তোমার আগের চিঠিখানির প্রাপ্তিস্বীকার এত দেরী হলে া।

আমার কবিতা পড়া তোমার ভালো লেগেছে জেনে খুবই খুশী হলুম। আমার লেখা সম্বন্ধে তুমি যে মন্তব্য করছ, ত্য আম ার পক্ষে অত্যন্ত গৌরবকর। কিন্তু আমার বিশ্বাস তুমি আমার প্রতি পক্ষপাতী, এবং সেই জন্য আমার লেখা তোমার প্রিয়। সে লেখার দোষ যথেষ্ট আছে, সে সব দোষ আমার নিজের অবিদিত নয় বলেই, লিখে আত্মপ্রসাদ পাই না, যদিও মানি যে ফাঁকি দিয়ে কাজ সারার প্রবৃত্তি আমার নেই।

"প্রতিধবনি" কবে বেরোতে বলতে পারছি না----প্রকাশককে জিজ্ঞাসা করলে জবাব পাই, অবিলম্বে। কিন্তু বইখানা ছ াপতে গেছে আটমাস আগে, এখন পর্যন্ত মাত্র একটা প্রুফ শুধরেছি। যাই হোক, বেরোলেই এক কপি তোমাকে পাঠিয়ে দেব।

তোমার স্বাস্থ্যের কথা এবার লেখোনি। আশা করি উন্নতির দিকে দ্রুত এগোচছ। শীত কমেছে? বাড়ি থেকে নিয়মিত বেরে

ানোর অনুমতি পেয়েছ?
ইতি ২৭ জানুয়ারী ১৯৫৫
ভবদীয়
সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

ততদিনে স্ট্রেপটোমাইসিন নামে একটা নতুন ওষুধ বাজারে বেরিয়ে গেছে। সেই ওষুধের সঙ্গে প্রচুর বিশ্রামের মানে প্রচুর বই পড়ার আর নিয়মিত খাওয়াদাওয়ার ফলে আমি বেশ তাড়াতাড়িই সেরে উঠছিলাম। ড. নন্দী বলে দিয়েছিলেন যে অতিরিক্ত পুষ্টিকর খাবারদাবারের উপর যেন নির্ভর না করি, কারণ খুব উন্নত খাবারের গুণে ক্ষয় রোগ সারালে পরে যখন স্বাভাবিক খাবারে ফিরে যাব তখন রোগটাও ফিরে আসতে পারে।

ইতিমধ্যে দাদা দোলের ছুটিতে দু-তিন দিনের জন্য কলকাতা থেকে আজব মূর্তিতে জলপাইগুড়ি এসেছিলেন কোনও পারিবারিক কারণে। তিনি যখন হোস্টেল থেকে শেয়ালদায় আসছিলেন তখন রাস্তার ছেলেরা কোথা থেকে একটা নোংরায় চোবানো ছেঁড়া মাদুর দাদার গায়ে ছুঁড়ে দিয়েছিল। স্টেশনে পৌঁছে হাতমুখ ধুয়ে ছিলেন, কিন্তুসঙ্গে বাড়তি জামাকাপড় নেননি বলে সেগুলো বদলাতে পারেননি। সেবার দাদা আমার জন্য এনেছিলেন প্রুস্ত-এর লেখা 'সোয়ান'স ওয়ে' উপন্যাসটি। ওই দু - তিন দিন বাড়িতে থাকার সময় আমার লেখা সুধীন্দ্রনাথের চিঠিগুলি পড়ে বেশ অবাক হন দাদা। বললেন যে সুধীন্দ্রনাথকে সবাই অভিজাত অহংকারী ধনীপুত্র বলে জানে, তিনি রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য, তাঁর সঙ্গে ঘুরেছেন অনেক আর পড়েওছেন প্রচুর, কারণ টাকার অভাব না থাকতে লেখাপড়া ছাড়া জীবনে নাকি কোনও কাজ করতে হয়নি তাঁকে। এরকম কিছুকিছু কথা আমি আরও কারও কারও মুখে শান্তিনিকেতেনও শুনেছিলাম। তা ছাড়া বামপন্থী বুদ্ধিজীবী মহলেও তাঁর সম্বন্ধে একই রকম নানা ভুল ধারণা চালু ছিল। দাদার কথা শুনে আমার মনে হল, সুধীন্দ্রনাথ যদি নিজের অধ্যয়ন, অভিজ্ঞতা ও অনুভবের কথা নিজেই বিস্তারিত ভাবে লেখেন তা হলে ওইসব বাজার - চলতি ভুল ধারণার নিরসন হবে। তাঁর কবিতা ও প্রবন্ধ, বিশেষত কবিতাগুলি , মন দিয়ে পড়লেই বোঝা যায় যে সেগুলির কলাকৌশলের আড়ালে উপন্যাসের উপাদান লুকিয়ে আছে যেমন প্রুস্ত - এরউপন্যাসের মধ্যে রয়েছে আত্মজীবনীর উপকরণ। এবার তাই তাঁকে আত্মজীবনী লেখার জন্য অনুরোধ জানিয়ে একটা চিঠি দিলাম।

বেশ কিছুদিন পরে সুধীন্দ্রনাথের উত্তর পেলাম। লিখেছেন,

তোমার ৮ তারিখের চিঠি আমার হাতে আসতে দিন দশেক দেরি হয়েছিল, কারণ আমরা ১৯ তারিখ পর্যন্ত দিল্লিতে ছিলুম। উত্তরের বিলম্ব এই জন্যে।

তোমার স্বাস্থ্যের খবরে যৎপরোনাস্তি খুশী হয়েছি। তুমি সেরে উঠবে তা আমি নিশ্চয় জানতুম, কিন্তু এত শীঘ্র সুস্থ হয়ে যাবে এমন আশা করতে ভয় পাচ্ছিলুম। সে যাক, এখনও কিন্তু সাবধানে থেকো এবং গরমে কলকাতায় আসা উচিত হবে কি না ভেবে দেখো।

"প্রতিধবনি", শুনছি, ছাপা শেষ হয়েছে। তা হলেও দিন - পনেরোর আগে বইখানা আমার হস্তগত হবে বলে বিশ্বাস হচ্ছে না। পেলেই তোমাকে পাঠাব। অন্য বই তৈরী করার প্রেরণা পাচ্ছি না, সময় তো নেই -ই।

আমার জীবনে এমন কোনও রোমাঞ্চকর ঘটনা ঘটেনি, যার কৃপায় আত্মজীবনী লিখলে সুখপাঠ্য হবে। আমার মানস পরিণতির বিবরণ আমার লেখার মধ্যে যেটুকু আছে তার বেশী সন্ধানযোগ্য নয়। অতএব ও - বিষয়ে চিঠিতে বাক্যব্যয় করে লাভ নেই।

ইতি ২৩ মার্চ ১৯৫৫
ভবদীয়
সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

সেই গরমে সুধীন্দ্রনাথ কলকাতা যেতে আমায় বারণ না করলেও যাওয়া হত না, কারণ তখনও আমি জলপাইগুড়ি শহরেই ইচ্ছেমতো ঘুরে বেড়াবার ছাড়পত্র পাইনি। তবে প্রায় ছ মাস ধরে কার্যত ঘরে থেকে আমি তখনহাঁপিয়ে উঠেছি। কাঁহাতক বই পড়ে পড়ে কাটানো যায়! শুধু ঘরের বাইরে যাবার জন্য নয়, জলপাইগুড়ির বাইরে, বিষেশত কলকাতায় য

াবার জন্য মনে মনে চাঞ্চল্য বোধ করছিলাম। সুধীন্দ্রনাথের চিঠিটা অবশ্যই মনের চাঞ্চল্যকেসামলাতে সাহায্য করেছিল। সেই চিঠিখানি পাবার কিছুদিন পরেই তাঁর কাছ থেকে একটা রেজিস্টার্ড প্যাকেট পাই। খুলে দেখি 'প্রতিধ্বনি'র কপি। ভেতরে তাঁর দস্তখতের তারিখ ৬.৪.৫৫। বোধহয় প্রকাশকের কাছ থেকে প্রথম যে কয়েকটি কপি পেয়েছিলেন তার থেকেই আমায় এক কপি পাঠিয়েছিলেন কাল বিলম্ব না করে। আগের চিঠিতেই তো তিনি জানিয়েছিলেন, বইখানি তাঁর হাতে পৌঁছতে আরও দিন পনেরো লাগবে। আমি নিশ্চয়ই অভিভূত হয়ে তাঁকে তখনই চিঠি পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু তার আর উত্তর পাইনি। পরের মাসেই তিনি সস্ত্রীক ইউরোপ ভ্রমণে যান।

তার পরের মাসে অর্থাৎ ১৯৫৫-র জুনে ইন্দোনেশিয়ার বাদুং শহরে ২৯টি দেশের এক ঐতিহাসিক সম্মেলনে ঠাণ্ডা যুদ্ধের দু যুযুধানপক্ষের বাইরে জোটনিরপেক্ষ শান্তিবাদী রাজনীতির প্রধান শক্তি হিসেবে উদ্‌গত হল ভারত। সেই উপলক্ষে সুধীন্দ্রনাথের '১৯৪৫' নামের কবিতাটির আদলে কিন্তু উলটো ভাবনায় আমি 'জুন ১৯৫৫' নামে একটি কবিতায় লিখে ফেললাম, 'স্বাধিকারে ধৃত মানবের পটভূমি/ সুপ্রতিষ্ঠ অনুকূল প্রতিদান---/ সভ্যতা - নভেউপনীত মৌসুমি/সহযোগী বোধে পুষ্ট বর্তমান।' বুলগানিন তখন রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন আর সেই সঙ্গে শুহয়েছে লৌহ যবনিকার উত্তোলন। বিশ্ব-রাজনীতিতে দেখা যাচ্ছে প্রচুর সদর্থক সম্ভাবনা। আর সেসবের সঙ্গে তালমিলিয়ে আমার শরীরও সেরে উঠতে লাগল। জলপাইগুড়িতে তখন ভরা বর্ষা। করলা নদী উপচে আমাদের উঠোনেএক হাঁটু জল, উঠোন থেকে চার ফুট উঁচু বারান্দা থেকে দেখছি সেই জলে খেলে বেড়াচ্ছে নানা মাপের মাছ, শুধুবেলে মাছ নীচের মাটির সঙ্গে মিশে নিঃসাড়ে শুয়ে। একদিন বর্ষণক্ষান্ত আকাশে রামধনু উঠেছে দেখে সুধীন্দ্রনাথের 'কাস্তে' কবিতাটি অবলম্বনে লিখলাম, 'সারাদিন ধ'রে গভীর বর্ষা শেষে/রামধনু আঁকা আকাশে, / সৌহার্দ্যের বাঁধা দেশে দেশে/ মনে হয় যেন আভাসে/ বর্বরদের চিৎকার করে স্তব্ধ/ সহজিয়া এক বোধ হল উপলব্ধ/ যেখানে পৃথিবী উর্বর, বৈদগ্ধ্য/ মনীষা প্রীতির বিকাশে। / মুগ্ধ নয়নে চেয়ে থাকি অনিমেষে / রামধনু আঁকা আকাশে।' আমি তখন একদিকে যেমন সুধীন্দ্রনাথের শব্দ - বিন্যাসে আপ্লুত তেমনই অন্যদিকে প্রচণ্ড আশাবাদী। সেই ঝোঁকে ঠাণ্ডা - যুদ্ধে মত্ত পৃথিবীর থেকে পৃথক আর - এক পৃথিবীর অস্তিত্ব ঘোষণা করে 'দ্বিতীয় পৃথিবী' নামে সুধীন্দ্রনাথীয় একটি সনেটও লিখে ফেললাম, 'নির্বাণ সাম্রাজ্য সাধা, অনুবন্ধী সভ্যতা বিপ্লব,/ ব্যক্তির কৈবল্য হেতু সমভাব সিদ্ধ সমাজের, / পদে পদে অবিরাম অনন্ত নির্মাণ বাস্তবের;/ দধীচির বদ্ধ মুঠি ; প্রেমে শুদ্ধ কর্মের উৎসব। / দ্বিতীয় পৃথিবী যেন প্রজ্বলন্ত বসন্ত - সঙ্কাশ, / উর্বর তটেতে তার জীবনের উদ্দাম বিকাশ।' হয়তো আমার উৎসাহ দেওয়ার আর খুশি করার জন্য কার্তিকদা আর সোমনাথ মিলে সেগুলি নিয়ে একটা কবিতা পুস্তিকা বের করার তোড়জোড় করলেন। তাঁরা দুজনেই 'জলার্ক'-র জীবনানন্দ সংখ্যা বের করেছিলেন। এবারেও আমি আরামসে ঘরে বসে বর্ষা উপভোগ করলাম আর ওঁরা প্রেস, কাগজের দোকান ও দপ্তরিখানা সামলালেন। যতদূর মনে পড়ে, খরচও ছিল তাঁদের দুজনের। ততদিনে শরৎকাল এসে গেছে। ফার্মেসি ট্রেনিং সেন্টারে পুজোর ছুটিতে কার্তিকদা বেতিয়া চলে গেলেন আর বনবিহারী আর মৃণাল এল। আমরা আবার সেই জলপাইগুড়ির কলেজে পড়ার সময়কার দলে বেঁধে পুজো দেখে বেড়ালাম, এমন কী করলা নদীতে বিজয়া দশমীর ভাসানও দেখলাম। আগের বছর পুজো কাটিয়েছিলাম বিছানায় শুয়ে আর বিজয়া দশমীর সন্ধ্যায় গিয়ে বসেছিলাম বারান্দায়, তখন সঙ্গ দিয়েছিল কমলেশ আর করলা নদীর ধার থেকে ভেসে আসছিল ভাসনের ঢাক-কাঁসার, মধ্যে মধ্যে মা-দুর্গার জয়ধ্বনি, ঘনঘন আকাশে উড়ে যাচ্ছিল আলোর তিরের মতো হাউই।

ইতিমধ্যে মা জলপাইগুড়ির স্যাঁতসেঁতে জলহাওয়া আমার স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো নয় ভেবে কলকাতার কাছে দক্ষিণ শহরতলিতে এক টুকুরো জমি কিনেছিলেন। দাদার প্ল্যান ছিল কমিউনিস্ট পার্টির হয়ে জলপাইগুড়ির কৃষক - শ্রমিক সমাজে কাজ করা, হয়তো নির্বাচনেও লড়া। স্বভাবতই যাদবপুর অঞ্চলে জমি কেনার ব্যাপারে তাঁর আপত্তি ছিল । তাঁর আর -একটা যুক্তি ছিল যে জমিটা যেখানে কেনা হচ্ছে তার খুব কাছেই যক্ষ্মা হাসপাতাল। কিন্তু মায়ের এক মামীমা ছিলেন, সুষমা গোস্বামী, যিনি মাকে তাঁর বাড়ির কাছেই জমি কেনানোতে ভজান। জলপাইগুড়ির ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ প্রণব দাস কলকাতায় গিয়ে জেসপ কোম্পানিতে যোগ দিয়েছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে দু-তিন মাস পড়েছিলাম তখন প্রণবদা - বিজুদির বাসাতেই থাকতাম। এবার প্রণবদারাই স্বেচ্ছায় মায়ের বাড়ি করে দেওয়ার ভার নিলেন। আমি যখন কলকাতায় এসে নিজেদের বাড়িতে উঠলাম তখনও বাড়িটার দরজা জানলা বসেনি, বাথমও হয়নি।

বিজুদি আমায় একটা ডবল বেডের তক্তপোশ, তোশক ও বালিশ কিনে দিয়েছিলেন, দিদিমা লণ্ঠন দিয়েছিলেন। আমি কিনেছিলাম একটা ডেক চেয়ার। তাই শুনে ধীরাজ ভট্টাচার্য বলেছিলেন, একদিন পিকনিক করতে আসবেন আর প্রেমেন, ন া তিনি, কে বসবেন চেয়ারটাতে সেটা টস করে ঠিক করা হবে। আমার স্নান - খাওয়া সব তখন দিদিমার বাড়িতে। একদিন সুভাষদা এলেন। দিদিমার রান্না খেয়ে একেবারে অভিভূত। দিদিমা সিমলা পাড়ার অতীন বসুর মেয়ে, অমর বসুর ছোট বোন। স্বামী বিবেকানন্দের ভাই ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত দিদিমাকে সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন কলকাতার সেরা রাঁধুনি বলে। সুভ াষদা বললেন, বিনা নোটিসে মামুলি রান্নায় এমন স্বাদ বের করা যায় তা তাঁর জানা ছিল না। খেয়ে দেয়ে আমরা বের হলাম পাড়া বেড়াতে। আমরা সেন্ট্রাল পার্কথেকে এখনকার রাজা সুবোধ মল্লিক রোড পার পয়ে বা পুজিনগর কলোনির ভেতর দিয়ে একটা বিশাল পুকুরের পাড়ে বাঁধানো ঘাটে এসে বসলাম। শুনলাম এটার নাম লায়েলকা পুকুর আর প াশেরটাকে বলে লায়েলকার মাঠ। এসব ছিল রানিকুঠির লায়েলকাদের জমি। বিধান রায়ের উদ্যোগে এই জমি রাজ্য সরকার কিনে নেয়। পুরো সরকারি জমিটার নাম হয় রিজেন্ট এস্টেট। এর উত্তর - পূর্ব অংশে সরকারি আবাসন নির্মাণের কাজ শু হয়েছে, কিন্তু বাকি জমিটা শুধুই মাঠ, এত বড় মাঠ যেখানে অনায়াসে খান পনেরো কি আরও বেশি ফুটবল' খেল ার মাঠ হতে পারে। সেই মাঠের পশ্চিম প্রান্তের শেষে গাছপালার মাথায় সূর্য অস্ত যাচ্ছিল। সুভাষদা অবাক। কলকাতার এত কাছে এত বড় প্রান্তর আর তার সীমান্তে এমন সবুজ দিগন্ত আর সেখানে এমন আশর্চর্য সূর্যাস্ত! সেদিকে মাঠের উপর দিয়ে অনেকটা হেঁটে গিয়ে আমরা আরও তিনটে পুকুর দেখতে পেলাম। এই পুকুরগুলোর ওপারে বিজয়গড় কলোনি। চ ারদিকে উদ্বাস্তুদের উপনিবেশ, মাঝখানে দীপের মতো রিজেন্ট এস্টেটের বিশাল ফাঁকা জমি। তখন কি ভেবেছিলামযে ব ারো বছর পরে এখানেই আমরা বাস করতে আসব আর শতাব্দী শেষ হবার আগেই বড় বড় বিল্ডিঙে এমন ভরে যাবে এখানটা যে লায়েলকার মাঠ বলে কিছু থাকবে না।

যা হোক, এর মধ্যে কয়েকবার সুধীন্দ্রনাথের খোঁজে রাসেল স্ট্রিটে গেছলাম। চার তলা পর্যন্ত উঠতে হয় না। নীচের লে াকজনদের থেকেই খবর পাওয়া যায়। তাঁর ফিরে আসাটা পেছিয়ে পেছিয়ে যাচ্ছে বারবার। আমি অধীর হচ্ছিলাম তাঁকে দুটো জিনিস দেখাতে। তার একটা ছিল 'প্রতিধবনি'র রিভিউ, বেরিয়েছিল 'দীপিকা' নামে এক পত্রিকার পুজো সংখ্যাতে, সেটির সম্পাদক ছিলেন দেবীপ্রসাদ ভট্টাচার্য, বোধহয় কোনও প্রাইভেট কোম্পানির পিআর ও ছিলেন। অন্য যে জিনিসটা দেখাতে চেয়েছিলাম সেটা হল আমার সেই চটি কবিতার বই। শেষে সেই রিভিউর কপি ও বইটি তাঁকে ডাকেই পাঠিয়ে দিলাম। তার সঙ্গে লিখলাম আগের বারের মতো ভ্রমণের ভিত্তিতে কবিতানিশ্চয়ই লিখেছেন কিন্তু এবারে যে এতদিন ধরে ভ্রমণের কাহিনিটাও বিস্তারিত ভাবে লেখেন। ভ্রমণকাহিনি লেখা তাঁর পছন্দ নয় জেনেও লিখলাম এই ভেবে যদি তাঁর পছন্দ বদলায়। যখনই আসুন, জমানো চিঠিপত্রের ভেতর আমার চিঠিও পাবেন। সত্যিই তো এত খরচপাতি আর তে াড়জোর করে যাওয়া! ফিরব ভাবলেই ফেরা কঠিন! কিন্তু কিমাশর্চর্যম্ অতঃপরং। এক সপ্তাহের মধ্যেই তাঁর চিঠি---

তোমার ২৭ তারিখের চিঠি ও কবিতার বই আজ সকালে পৌঁছল। 'দ্বিতীয় পৃথিবী' মাত্র উলটে দেখেছি---তাতে যতটুকু চোখে পড়ল তা মনোজ্ঞ। বড় কবিতাটি তো আগেই পড়েছিলুম এবং পড়ে ভালো লেগেছিল তাও বোধহয় জানিয়েছিলুম। 'প্রতিধবনি'র উদ্ধৃত সমালোচনার জন্যে আমার কৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জেনো। রচনাটি খুবই সুলিখিত, তবে আমার প্রতি তোমার যে পক্ষপাত আছে তা তাতে অপ্রকট নয়।

আমরা ১৩ তারিখে কলকাতা পৌঁছেছি প্রায় ন মাস পরে। মুখ্যত ফ্রান্স, ইংলণ্ড, স্পেন, ইটালি, গ্রীস ও ঈজিপ্ট্ --এই কট া দেশে অধিকাংশ সময় কেটেছে, যদিও এক স্পেন ছাড়া অন্যত্র বেশী ঘোরাঘুরি করতে পারিনি। ভ্রমণকাহিনী লেখা আম ার আসে না---এবং অনেক বছর আগে যখন প্রথম দেশের বাইরে যাই তখন অল্পবয়সের গুণে ও অপরিচয়ের বিস্ময়ে ম ানস প্রতিত্রিয়া যদিও খুবই সুলভ ছিল, তবু আমার অভিজ্ঞতা যে অত্যন্ত সাধারণ তা বুঝতে কষ্ট হয়নি। সেই আত্মজ্ঞান আজ আরও জোর পেয়েছে।

সে যাই হোক, তুমি নিজে কেমন আছ? কলকাতায় যখন রয়েছ তখন বোধহয় ভালো। এখন কি তুমি বাইরে যাও? আম াদের ফ্ল্যাটের পর্বতপ্রমাণ সিঁড়ি ওঠার অনুমতি আছে? থাকলে একদিন এসো। নচেৎ স্থির হয়ে বসতেপারলে, আমিই তে ামার সঙ্গে দেখা করে আসব।

ইতি ১লা মার্চ ১৯৫৬

ভবদীয়
সুধীন্দ্রনাথ দত্ত
এতদিন বাদে এত দেশ ঘুরে এত দেখাশোনা সেরে আসছেন, অথচ আমার শরীরের কথা ভোলেননি। আগের মতো না হলেও আমি তো এখন বেশ সুস্থ। দিদিমার রান্নার গুণে আমার খাওয়ার পরিমাণও বেশ বেড়েছে। সুতরাং সুধীন্দ্রনাথের চার তলার ফ্ল্যাটে আস্তে আস্তে সিঁড়ি ভেঙে একদিন গিয়ে হাজির হই। প্রথমে ভাবলেন তিনি থাকবেন কি না! কিন্তু চায়ের বদলে এল কোকো মেশানো এক কাপ দুধ। রাজেশ্বরীও এসে বসলেন। বিদেশের অভিজ্ঞতা সুধীন্দ্রনাথ দু - এক কথায় স ারলে রাজেশ্বরী মনে করিয়ে দিলেন প্যারিসের এক অনুষ্ঠানে সুধীনকে কবিতা পড়তেওহয়েছিল। খানিকক্ষণ ইউরোপ ও আ ফ্রিকা নিয়ে কথাবার্তার পরে সুধীন্দ্রনাথ তাঁদের কথা চাপা দিয়ে আমার কথা জানতে চাইলেন। জলপাইগুড়িতে অসুস্থ থ াকাকালে জয়স -এর 'ইউলিসিস' আর প্রুস্থ - এর 'অতীতের দিনগুলির স্মৃতিচারণ' আর মান-এর 'ইন্দ্রজাল পর্বত', পড়ে আমার মাথায় ঘুরছিল একখানা অন্তর্মুখী মনোবিশ্লেষণমুখী উপন্যাস লেখার কথা। লিখেও ফেলেছিলাম খানিকটা। সুধীন্দ্রনাথ বললেন যিনি নিজে উপন্যাস লেখেন আর যিনি উপন্যাসের সমালোচক তেমন দুজনের সঙ্গে আলোচনা করতে আর প্রতিদিন নিয়ম করে কয়েক পাতা করে লিখতে।
সুধীন্দ্রনাথের পরের চিঠিতে ওই উপন্যাস লেখার প্রসঙ্গ এসে গেল। পুরো চিঠিটা এই,
তোমার চিঠি পেয়ে খুশী হয়েছি।
কবিতা - চারটি ফেরৎ পাঠালুম। ছন্দে কোনও গোলমাল আমার চোখে পড়ল না। ''অসময়ে বৃষ্টি'' চার মাত্রার লঘুগু ছন্দ---অর্থাৎ এর পর্বে চারটে হ্রস্বস্বর অথবা ওই ওজনের অন্য মাত্রা আছে এবং পদান্তে স্থান পেয়েছে ওই পরিমাণের অর্ধ - পর্ব। এ ছন্দকে ৪+৪ মাত্রার দুটো পর্বকে ৩+৩+২ বা ওইরকম কোনও ভাগে ভাগ করা যায় ।''নায়িকা'' -র চতুর্থ, অষ্টম ও দ্বাদশ পংক্তিতে দশ অক্ষরর পদ বসালে দোষ হবে না, বরঞ্চ লাইনের গাম্ভীর্য ওপরিপূর্ণতা বাড়বে।
কিন্তু ভাষা ও ভাবের দিক থেকে লেখা চারটির উন্নতি নিশ্চয়ই সম্ভবপর, এবং আমার বিবেচনায় যে রচনার শোধন শুধু ধৈর্যসাপেক্ষ তার প্রকাশ অনুচিত।
অন্নদাশঙ্কর রায় ও নারায়ণ চৌধুরী মহাশয়ের সঙ্গে তোমার পরিকল্পিত উপন্যাস সম্বন্ধে আলোচনা করে খুব ভালো করেছ, এবং তাঁদের পরামর্শে আমারও সম্পূর্ণ সায় আছে। আমি তাড়াতাড়ি লেখার পক্ষপাতী নই---যথেষ্টভাবেই এবং যথাসাধ্য পরিশ্রম করে লিখলেই ভালো লেখা বেরোয়।
আমার সমস্ত লেখাই তোমার মনে ধরবে এমন প্রত্যাশা আমার নেই। বরঞ্চ যখন মনে পড়ে যে তোমার আর আমার মধ্যে মতান্তরের অন্ত নেই, তখন যতখানি তোমার ভালো লাগে, তা দেখেই আমি আশর্চ্য হই এবং কৃতজ্ঞ বোধ করি। তা ছাড়া এটাও ভুললে চলবে না যে লরেন্স - কৃত মৎকৃত অনুবাদ সম্বন্ধে বুদ্ধদেব বসুর মতো সহৃদয়সমালোচকও তোমার দলে। আশা করি কুশলে আছ। আর এক দিন এসো।
ইতি ১৬ই মার্চ ১৯৫৬
তোমাদের
সুধীন্দ্রনাথ দত্ত
এই চিঠিটার জন্য বোধহয় কিছু টীকা প্রয়োজন। 'একক' কবিতা পত্রিকার জন্য কয়েকটি কবিতা নিয়ে গেছলাম সম্প াদকের কাছে। সম্পাদক শুদ্ধসত্ত্ব বসু আমাকে খুবই স্নেহ করতেন কিন্তু স্নেহে অন্ধ হয়ে ছন্দ নিয়ে আমার পরীক্ষা অনুমে াদন করলেন না। তখন আমি সেগুলির ছন্দ - বিচারের জন্য সুধীন্দ্রনাথকে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। তিনি ছন্দ - পরীক্ষাটা মেনে নিলেন, কিন্তু ভাষা ও ভাবে দুর্বলতা বরদাস্ত করতে রাজি হলেন না। আমার মুরোদে ছন্দ - পরীক্ষাটা রক্ষা করে বিষয় ও প্রকাশের ত্রুটি দূর করা সম্ভব হলো না। তার চাইতে উপন্যাসটার পেছনে পরিশ্রম করলে যে ভালো হয়। নার ায়ণবাবু অবশ্য মানতে চাইলেন না, বাংলায় ওরকম অন্তমুর্খী উপন্যাসের কোনও সার্থকতা আছে, কিন্তু অন্নদাশঙ্কর আম াকে দিয়ে উপন্যাসটা আবার নতুন করে লেখালেন। তাতে উপন্যাসের তীব্রতা হ্রাস পেল, কিন্তু রূপের দিক থেকে আর - একটু সন্তোষজনক হল, তার পর তিনিই ডি. এম. লাইব্রেরির গোপালদাস মজুমদার মহাশয়কে বলে দিলেন আমার প্রথম উপন্যাস 'একই সমুদ্র' বের করার জন্য। একই সঙ্গে আমি গ্যেটের উপর একটা প্রবন্ধ লিখে সুধীন্দ্রনাথকে দিয়ে এল

াম তাঁর মতামতের জন্য। সেটি পড়ে তিনি লিখলেন,

গ্যেটে সম্পর্কে তোমার প্রবন্ধটি পড়ে রেজিষ্ট্রি ডাকে ফেরৎ পাঠিয়েছি---আশা করি পেয়েছ। লেখা ভালো এবং গ্যেটে সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্যও আছে অনেক। কিন্তু তাঁর বিষয়ে তোমার নিজের বক্তব্য যেন স্পষ্ট হয়নি। লেখাটির উদ্দেশ্য যদি হয় উপার্জন তাহলে এতে অবশ্য কিছু এসে যায় না, কিন্তু সাহিত্যিক খ্যাতির দিক থেকে এ -রকম লেখার দাম হয়তো কম ---সমালোচনা হিসেবেও তাই।

আশা করি ভালো আছ। শরীরের যত্ন কোরো।

ইতি ২৬শে এপ্রিল-১৯৫৬

ভবদীয়

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

এইসব পুরনো কথা লিখতে লিখতে একটা প্র মনে জাগছে। সুধীন্দ্রনাথ কি অন্নদাশঙ্কর যখন পঞ্চাশ - পঞ্চান্ন বছর বয়সে খ্যাতির শিখরে ও সেই সঙ্গে নিজের নিজের কাজে প্রচণ্ড ব্যস্ত তখন আমার মতো অখ্যাত ও নবীন লেখকের কবিতা বা উপন্যাসের জন্য যেরকম ভাবনা ও সময় খরচ করেছিলেন আজকের ওই পর্যায়ের সাহিত্যিকরা কি সেরকম করবেন? আজকের অগ্রজরা তাঁদের অনুজদের প্রতি কি একই রকম অনুকম্পায়ী? শুধু সুধীন্দ্রনাথবা অন্নদাশঙ্কর কেন, সেখানের অনেক শিল্পী ও মনীষীর মধ্যে তণদের প্রতি যে মনোভাব ছিল তা যেন আজকের দিনে দুর্লভ। সুনীতিকুমারের 'দ্বীপময় ভারত' পড়ে যখন তাঁকে প্রথম চিঠি দিয়েছিলাম তখন আমি স্কুলে ক্লাস সেভেন-এইটের ছাত্র এবং স্কুলে ও বাড়িতে অনেকেরই তখন ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যে আমার জীবন কাটবে বস্তিতে কালো হাফপ্যান্ট পড়ে। একবার কী খেয়ালে সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণকেও চিঠি দিয়েছিলাম, তিনি তখন ভারতের উপরাষ্ট্রপতি,আর বিশ্ববিখ্যাত ভারতীয় দাশনিক তো বটেই। তিনিও নিজে হাতে লিখে উত্তর দিয়েছিলেন আজকের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের কাছ থেকে এই রকম সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার প্রত্যাশা করা যায়?

এই সময় 'কবিতা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় সুধীন্দ্রনাথের 'তীর্থপরিক্রমা' ও 'ভূমা' নামে দুটি কবিতা এবং সেই সঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর কয়েকটি কবিতা যা পরে তাঁর 'যে আঁধার আলোর অধিক' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়, কিন্তু এতদিন পরে বুদ্ধদেবের কবিতাগুলির নাম মনে নেই। সুধীন্দ্রনাথের এই কবিতা দুটিতে তাঁর আগের কবিতাগুলির থেকে দৃষ্টিভঙ্গির বেশ কিছুটা পার্থক্য দেখা যায়---তাঁর আগের কবিতাতে অন্ধকার বৈনাশিক কালো যে প্রকোপ দেখা যায় তা যেন কিছুটা আলোতে অাভাসিত হয়ে গেছে কবিতা দুটিতে। আর - একটা জায়গায় ছিল বিভ্রান্তির অবকাশ। 'ভূমা' কবিতাটির একটা পঙ্‌ক্তিতে আছে, 'যার সারথ্যে ও সখ্যে ক্লৈব্য থেকে মুক্ত ক্ষণবাদী বলে'। কীভাবে পড়ব এই পঙ্‌ক্তিটি? এখানে চোখের দেখায় ২+৩+৩+৪+৬+২ মনে হলেও আসলে এখানটা ৬+২+৪+৬+২ পর্ব ভাগ করে পড়া উচিত। পক্ষান্তরে বুদ্ধদেব বসুর সনেটগুলিতে যেন এক প্রকার জবরদস্তি রয়েছে বলে আমার মনে হয়েছিল। আমার পর্যবেক্ষণের উত্তরে সুধীন্দ্রনাথ লিখলেন,

তোমার ১৭ তারিখের চিঠি পেয়ে খুশী হলুম এবং গর্ব অনুভব করলুম এ - বারের কবিতায় প্রকাশিত আমার লেখা দুটো তোমার ভালো লেগেছে জেনে। কবিতার বিষয়বস্তু কি না, এর উপরে কবিতার উৎকর্ষ নির্ভর করে না বলে আমার বিশ্বাস। তবে আরও দু-একজন বর্তমান কবিতা - কটায় শূন্যবাদের হ্রাস লক্ষ করেছেন, যদিও অপরে বলেছেন যে এখানে আমার দুঃখবাদ আরও পরিষ্কার। সে যাই হোক, দশটা প্রায় এক সুরে কবিতা ''দশমী'' নামনিয়ে ইতিমধ্যে সিগনেট প্রেস থেকে বেরিয়েছে---তুমি যে - দুটো পড়েছ সে দুটো তারই অন্তর্গত।

ছন্দ নিয়ে বুদ্ধদেব বসু সম্প্রতি যে পরীক্ষা শু করেছেন, তা আমার মতে বাংলা ছন্দের প্রকৃতি বিদ্ধ। কিন্তু অনেকে তাতে খুশী হয়েছেন। সুতরাং আমি বা তুমি যা ভাবছি তা ভুল হতে পারে। উপরন্তু মনে রাখা উচিত যে বুদ্ধদেব অভিজ্ঞ লেখক ছন্দ তিনি জানেন না বলে এমন লেখেননি, আমাদের আরও পাঁচ জনের মতো তিনিও ভাবেন যে বাংলা ছন্দের প্রসার বাড়ানো প্রয়োজন, এবং সেই জন্যেই তিনি বর্তমান পরীক্ষায় নিরত। অতএব আমাদের শ্রদ্ধাই তাঁর প্রাপ্য।

আশা করি ভালো আছ। তোমার বন্ধুর আমার সম্বন্ধে লেখাটি এখনও আমার চোখে পড়েনি---হয়তো এড়িয়ে গিয়ে থাকে, কারণ ফিরে এসে অবধি গাঙ্গেয় যথাবিধি পাচ্ছি বলেই আমার বিশ্বাস। সে যাই হোক, তাঁকে আমার সম্ভাষণ জানিয়ে

া এবং তুমি নিও।

ইতি ২০ জুন ১৯৫৬

এই চিঠির শেষ অনুচ্ছেদটার উপরে প্রসঙ্গোল্লেখ প্রয়োজন। আমি জলপাইগুড়ি ছেড়ে আসার পর পরই কার্তিকদাও চলে আসেন এবং রসায়ন বিদ্যা ছেড়ে বাংলা সাহিত্যে গ্রাজুয়েট হয়ে এম এ করে এবং বাংলা উপন্যাস নিয়ে অধ্যাপক সুকুম ার সেনের অধীনে গবেষণা করে ডক্টরেট খেতাব অর্জন করেন। আর ওই সময়েই বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের কয়েকজন মদন বন্দ্যোপাধ্যায়কে সম্পাদক করে 'গাঙ্গেয়' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ শু করেন। মদনদা অ্যান্টনি ফিরিঙ্গির জীবন অবলম্বনে একটি অনবদ্য উপন্যাস লিখেছিলেন এবং এই ফিরিঙ্গি কবিয়ালকে মদনদাই বঙ্গ সংস্কৃতির এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক রূপে আবিষ্কার করেছিলেন, কিন্তু করিতকর্মারা তাঁকে তাঁর প্রাপ্য গৌরব থেকে বঞ্চিত করে। যা হোক, এই গাঙ্গে য় পত্রিকাতে কার্তিকদা বামপন্থীদের কেতাবি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সুধীন্দ্রনাথের উপর একটি দীর্ঘ আলোচনা করেছিলেন। লেখ াটি পড়ে সুধীন্দ্রনাথ কী বলেন তা জানার জন্য কার্তিকদারখুব কৌতূহল ছিল। তবে আমি যখন তাঁকে ওই লেখাটির বিষয়ে লিখেছিলাম তখন পর্যন্ত সেটা গাঙ্গেয়তে বেরোয়নি।

আমি তখন কলকাতায় যাদবপুরের সেন্ট্রাল পার্কে দিদিমার তত্ত্বাবধানে বিশ্রামেই আছি। মাঝে মাঝে শহরে যাই সিনেমা কি বহুরূপীর নাটক কি বালা সরস্বতী বা দয়মন্তী যোশির নাচ অথবা আশ্রমিক সঙেঘর অনুষ্ঠান দেখতে। তখন তো অ্যাক াডেমি অব ফাইন আর্টস কিংবা রবীন্দ্রসদন হয়নি, বেশির ভাগ অনুষ্ঠান হত নিউ এম্পায়ার সিনেমা হল-এ। তখনকার দিনে এসপ্ল্যানেডেই ছিল ইউ এস আই এস নামে মার্কিন গ্রন্থাগার, তার বাতানুকূল পাঠকক্ষেপ্রবেশ ছিল অবাধ। সেখান থেকে এনে পড়েছিলাম মেলভিল -এর অসাধারণ উপন্যাস 'মবি ডিক' -এর বিশাল মূলগ্রন্থ। কাছেই ছিল গ্রান্ড হে াটেলের নীচে শ্যামবাবুর দোকান এখনও আছে। আর কখনও যাই প্রেমেন্দ্র মিত্রর বাড়িতে,কখনও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের, কখনও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কাছে। সুনীতিকুমার বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তি হলেও তাঁর মধ্যে যে কোনও বয়সের মানুষকে আলাপে আলাপে সম্মোহিত করার আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল। একদিন সকালে প্রেমেন্দ্র মিত্রর বাড়ি গেলে তখন তাঁর সঙ্গে সুধীন্দ্রনাথের 'প্রতিধবনি' নিয়ে কথা হল। তিনি মানলেন সুধীন্দ্রনাথের বলিষ্ঠতা সনেটের উপযুক্ত, কিন্তু তিনি প্রায়ই যেমন সব অচেনা কঠিন শব্দ ব্যবহার করেন তেমন শব্দ শেক্স্পীয়র নিশ্চয়ই ব্যবহার করতেন না, এবার নিজেই শেক্স্পীয়র অনুবাদ করে দেখাবেন কত প্রাঞ্জল বাংলাতেও শেক্সপীয়র অনুবাদ করা যায়। কথাটা সুধীন্দ্রনাথকে না জানিয়ে পারলাম না। তিনি লিখলেন,

তোমার ৩ তারিখের চিঠি যথাসময়ে পেয়ে খুব খুশী হয়েছি। প্রেমেন শেক্সপীয়রের সনেট অনুবাদ করবেন, এটা বাংলা স াহিত্যের পক্ষে অত্যন্ত সুখবর। আমার লেখা, মূল বা অনুবাদ, যে দুরূহতাদুষ্ট এ-কথা বলা আজ বাহুল্য, কিন্তু এমন বিশ্বাস প্রেমেনও হয়তো বেশী দিন পোষণ করতে পারবেন না যে শেক্সপীয়র জলবৎ সরল। তবে শুনছি তিনি ট্রাজেডি চতুষ্টয়ের কোন্ একটা নাকি তর্জমা করতে রাজী হয়েছেন, অতএব সে লেখকের প্রাঞ্জলতা সম্বন্ধে তাঁর অভিমত হয়তো ইতিমধ্যে অভিজ্ঞতাস্পৃষ্ট।

দু দিন আগে গাঙ্গেয় পেয়েছি, এবং তোমার বন্ধুর লেখাটি এক বার পড়েছি। তিনি এখনও লিখতে শেখেননি, এবং বাংলা ব্যাকরণে তাঁর ব্যুৎপত্তি অন্তত বর্তমান প্রবন্ধে প্রকট নয়। কাজেই প্রথম পাঠে এইটুকুই বুঝলুম যেআমার প্রতি তাঁর আক্রে াশ প্রায় ব্যক্তিগত----কে সে রহস্য অন্ত প্রথম পাঠে আমার কাছে উদ্ঘাটিত হয়নি, এবং রচনাটি বোধহয় দ্বিতীয় পাঠের মতো সারগর্ভ নয়। অতএব এ প্রসঙ্গে আমার বর্তমান মন্তব্য শুধু এই যে অমৃত বালভাষিতং।

আশা করি কুশলে আছ, এবং তোমার উপন্যাস এগোচ্ছে। গাঙ্গেয়তে তোমার গদ্য কবিতা ভালো লাগল, তবে এই প্রকরণের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় নেই, এবং ওর প্রতি আমার অনুকম্পার অভাবও অনস্বীকার্য নয়।

ইতি ৮ই আগস্ট ১৯৫৬

ভবদীয়

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

আমার এতদিন পরে মনে নেই, কার্তিকদারও মনে নেই, ঠিক কবে কার্তিকদাকে নিয়ে সুধীন্দ্রনাথের কাছে গেছলাম। কা

র্তিকদাকে অনেক ভরসা দিয়ে নিয়ে গেছলাম। তখনকার দিনে অত ফোন-টোন করে যাওয়ার প্রয়োজন হত না। যেতাম, যঁার কাছে যেতাম তিনি সময় দিলে বসতাম, নতুবা ফিরে আসতাম। সেভাবেই কার্তিকদাকে নিয়ে একদিন হাজির হলাম তঁার ফ্ল্যাটে, গিয়ে বললাম, ইনিই আমার সেই বন্ধু যিনি গাঙ্গেয়তে লিখেছেন আপনার বিদ্ধে। তিনি তৎক্ষণাৎ শুধরে দিয়ে বলেছেন, বিদ্ধ শব্দটার প্রয়োগ ঠিক হল না, বলো, আমার সম্বন্ধে। তার পর তিনি আপন স্বভাবমতো আমাদের সমাদর করে বসালেন ও কার্তিকদাকে তাঁর সিগারেট খাওয়ালেন। বৃষ্টিবাদলার দিন বলে আমরা একটু পরেই উঠে চলে এলাম। কিন্তু কার্তিকদা হতভম্ব হয়ে গেছলেন। বললেন, আমি যাই-ই লিখে থাকি - না কেন, উনি মানুষটা এত বড় মাপের যে আমরা ছুঁতে পারব না ওঁকে।

সুধীন্দ্রনাথের একজন প্রিয় বন্ধু ছিলেন আবু সয়ীদ আইয়ুব। তাঁকে ভালোবেসে বিয়ে করেছিলেন শান্তিনিকেতনের দর্শন - ছাত্রী গৌরী দত্ত। তাঁদের বয়সের ব্যবধান ছিল পঁচিশ বছরের। সেই সময় আইয়ুবের সম্পাদনায় সিগনেট প্রেস থেকে বেরোয় ‘পঁচিশ বছরের প্রেমের কবিতা’। আইয়ুব উর্দুভাষী ছিলেন, বাংলা শিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথপড়বার জন্য। আসলে ছিলেন পদার্থ বিজ্ঞানের ছাত্র, কিন্তু কর্মক্ষেত্রে হন দর্শনের অধ্যাপক এবং নন্দনতত্ত্ব ছিল তাঁরপ্রিয় বিষয়। ইংরেজ রোমান্টিক কবি শেলির মতো স্বপ্নে বিভোর অসাধারণ রূপ ছিল তাঁর, কিন্তু পরিচিতদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন বিপুল পাণ্ডিত্যের জন্য। ‘সংবর্ত’ কাব্যগ্রন্থটি সুধীন্দ্রনাথ আইয়ুবকেই উৎসর্গ করেছিলেন। আইয়ুব সম্পাদিত ‘পঁচিশ বছরের প্রেমের কবিতা’ বইটি অণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত ‘উত্তরসূরী’ পত্রিকায় আমি রিভিউ করেছিলাম। তার পিঠোপিঠি ‘সাহিত্যপত্রে’ করি ‘দশমী’-র দীর্ঘ আলোচনা। যদিও ‘সাহিত্যদপ্তর’ ছিল বিষ্ণু দে-র পত্রিকা তবু তিনি সর্বদা নেপথ্যে থাকতেন, সম্পাদক হিসেবে সামনে থাকতেন কখনও চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়, কখনও নবযুগ আচার্য, কখনও আশীষ বর্মণ, কখনও শান্তি বসু, কখনও বা আর কেউ। এঁরা পরিচিত ছিলেন বৈষ্ণব বলে যেমন নরেশ গুহ, অণ সরকার প্রমুখকে উল্লেখ করা হত বৌদ্ধ বলে। যা হোক আমি বরাবরই আইয়ুবের প্রতি গভীরভাবে শ্রদ্ধান্বিত হলেও ‘পঁচিশ বছরের প্রেমের কবিতা’র সম্পাদনার একটু কড়া সমালোচনাই করেছিলাম। সেটা দেখে সুধীন্দ্রনাথের প্রতিক্রিয়া কী হয় জানার জন্য আগ্রহী ছিলাম। আন্দাজ করতে পারছিলাম যে আইয়ুব খুশী হবেন না, আশঙ্কা করেছিলাম যে তাঁদের দরজা আমার জন্য বন্ধই হয়ে যাবে। কিন্তু সুধীন্দ্রনাথের চিঠি পেয়ে মনেভরসা হল, তা হলে আইয়ুব বোধহয় আমার সমালোচনাটাকে একেবারে উড়িয়ে দেবেন না। সুধীন্দ্রনাথ লিখলেন,

বোধহয় তোমার দু-খানি চিঠির জবাব দিতে পারিনি। শুধু ব্যস্ত নেই, নানারকম হাঙ্গামার মধ্যে দিন কাটছে। তোনও কাজ করতে পারছি না।

ইতিমধ্যে উত্তরসূরীতে তোমার লেখা সমালোচনা প’ড়ে খুশী হয়েছি। তোমার সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রে আমি একমত। কিন্তু যেখানে আমরা ভিন্ন পথের যাত্রী, সেখানেও তোমার বক্তব্য যুক্তিসহ, অতএব শ্রোতব্য।

সাহিত্যপত্রে আমার বিষয়ে তোমার লেখা পড়ার জন্যে উৎসুক হয়ে আছি। সেখানেও যদি সুযুক্তির প্রতিশ্রদ্ধা দেখিয়ে থাকো, তা হলে তোমার সিদ্ধান্তে আমার সায় আছে কি না সে প্রশ্ন উঠবে না।

‘‘স্বগত’’ -এর প্রুফ পাইনি। অন্য বইয়ে যে লেখা বেরোবে তার সংস্কার আস্তে আস্তে এগোচ্ছে, অথবা এগাচ্ছে না। অন্য কোনও লেখার চেষ্টাও করছি না।

তুমি এসে ফিরে গেছ জেনে দুঃখিত হলুম। আশা করি তোমার কুশল।

ইতি ৩১ আগস্ট ১৯৫৬

এখন যখন সুধীন্দ্রনাথের কথা মনে পড়ে তখন অবাক লাগে। কী আশর্চ্য মানুষ ছিলেন তিনি। আজীবন নিজের লেখায় উন্নতি ও সংস্কার সাধনে কী একান্তভাবে পরিশ্রম করে গেছেন। শুধু কবিতাগুলির নয়, গদ্য রচনাগুলিও। মনে পড়ে যায় জীবনানন্দের কথা, সেই যে তিনি বলেছিলেন, কবিতাগুলোর বারবার সংশোধনকরে সুধীনবাবুনিজেকেই ক্রমাগত শুদ্ধ করে চলেছেন। আবার পাশাপাশি দেখি, তাঁকে চিঠি লিখলে কী মনোযোগ দিয়ে সে - চিঠিতিনি পড়তেন। আমি নিশ্চয়ই আগের চিঠিতে লিখেছিলাম যে একদিন গিয়ে তাঁকে না পেয়ে ফিরে এসেছি। এইখবরটুকুর উপরে তাঁর দুঃখ প্রকাশ করার কোনও প্রয়োজন ছিল না। আমার হাতে সময় ছিল বা আমার ইচ্ছে হয়েছিল, আমি গেছি, তিনি কাজের মানুষ, তিনি বা

ড়ি ছিলেন না, ব্যাপারটা তো আসলে একটুকুই, ব্যাপারটাকে তিনি অনায়াসে উপেক্ষা করতে পারতেন, সেটাই স্বাভাবিক হত। এই চিঠির অল্পদিন পরেই তিনি আবার লিখলেন,

তোমার সব চিঠিই পেয়েছি, এবং 'দশমী'র সমালোচনাও একাধিকবার পড়েছি, কিন্তু এমনই ব্যস্ত আছি যে এ-পর্যন্ত জবাব দিতে পারিনি। সে জন্যে অপরাধ নিও না।

"দশমী" --প্রসঙ্গে তুমি যা বলেছ, সে বিষয়ে কিছু লেখা আমার পক্ষে শক্ত। তবে অতটা প্রশংসা নিশ্চয়ই আমার প্রাপ্য নয়। আবার লিখলে, আমার বিদ্ধে তোমার মতামত কি, তা আরও বিশদ কোরো। তুমি নিজেকে জানিয়েছ যে তোমার বর্তমান প্রবন্ধ একটু আগোছাল, কিন্তু প্রায় সব কথাই যুক্তিসহ, এবং আমার মনোভাব ও কাব্যাদর্শ বোঝার জন্যে তোমার নিরন্তর চেষ্টা আমার পক্ষে গর্বের বিষয়।

এ সম্বন্ধে আর কিছু লিখছি না, কারণ হাতে সময় বড় কম, দেখা হলে, বাকী কথা হবে, "স্বগত" - এর জন্যে লেখা পরিশষ্ট সম্পর্কেও। "স্বগত" -এর আর কোনও কৈফিয়ৎ বোধহয় দরকার নেই। সে -ইয়ের একটা ভূমিকা আছে, তাতে তখন আমি কি ঋাস করতুম, তারর পরিচয় দিয়েছিলুম। সেটা বর্তমান সংস্করণেও থাকবে।

আশা করি কুশলে আছ।

ইতি ৭ সেপ্টেম্বর ১৯৫৬

আমার এখনও আফসোস হয় 'দশমী'-র আলোচনাটা যথেষ্ট যত্ন নিয়ে তখন লিখিনি বলে। যতদূর মনে পড়ে 'সাহিত্যপত্রে' আর কার ও দশমীর আলোচনা করার কথা ছিল, তিনি যথাসময়ে দিতে পারেননি বা দিতে পারবেন না জানিয়েছিলেন বলে আমাকে শেষ লগ্নে আলোচনাটা লিখতে বলা হয়েছিল। শব্দ যাকে বলি তার অর্থ, তারমূল্য ও তার পরিচয় নিয়ে এবং কবিতার মৌল প্রাগুলো নিয়ে সুধীন্দ্রনাথ যেমন চিন্তা করেছেন তেমন আর কোনওআধুনিক বাঙালি কবি করেননি। এবং তাঁর সেসব চিন্তা - ভাবনার পরিণত ফসল 'দশমী'।

এই সময় এমন একটা কাণ্ড ঘটে যাতে আমরা কবিতার জগৎ থেকে রাজনীতির জগতে ছিটকে পড়ে গেলাম। বিশতম কমিউনিস্ট পার্টি কংগ্রেস স্টালিনরাজের বিদ্ধে প্রথম কণ্ঠ শোনা গেল। তার পরেই ওয়ারশ চুক্তি স্বাক্ষরকারী দেশগুলির অন্যতম হাঙ্গারিতে ঘটল এক অকল্পনীয় অভ্যুত্থান। আর তা দমন করার জন্য সোভিয়েত রাশিয়া পাঠিয়ে দিল বিরাট ট্যাঙ্ক বাহিনী। তখন সুধীন্দ্রনাথ, আইয়ুব বুদ্ধদেব বসু প্রমুখ বুদ্ধিজীবীরা সোভিয়েত পরাত্রমকে ধিক্কার জানিয়ে দৈনিক 'স্টেটসম্যান' -এ একটা চিঠি লেখেন। এদিকে জলপাইগুড়ি থেকে কমলেশ লিখেছিল সুধীন্দ্রনাথকে তার জন্য একটা কাজের কথা আবার মনে করিয়ে দিতে। আমি একই চিঠিতে স্টেটসম্যান-এ প্রকাশিত চিঠির প্রতিবাদ এবং কমলেশের চাকরির জন্য অনুরোধ করে পাঠালাম। সেই সঙ্গে বোধহয় এই অভিযোগও করেছিলাম যে সুয়েজ জাতীয়করণের জন্যে আমেরিকা যখন আসোয়ান বাঁধ নির্মাণের চুক্তি ভঙ্গ করে এবং ইংল্যান্ডফ্রান্স যখন মিশর আত্রমণে উদ্যত হয় অথবা ইজরাইলকে সিনাই দখলে উসকে দেয় তখন বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা নীরব থাকেন। তবে এতদিন পরে হুবহু মনে নেই যে তাঁকে ঠিক কী লিখেছিলাম। যা হোক, পত্রপাঠ উত্তর না এলেও দিন দশেকের মধ্যে তাঁর উত্তর এল।

তোমার ১৮ তারিখের চিঠির জবাব দিতে দেরী হল বলে কিছু মনে কোনো না। আমাদের ফ্ল্যাট মেরামত হচ্ছিল, কাগজ - পত্র কোথায় ছড়িয়ে পড়েছিল তার ঠিক ছিল না, এমন কি এমন একটু পরিষ্কার জায়গা পাচ্ছিলুমনা, যেখানে বসি।

হাঙ্গারী - সংত্রান্ত আমাদের প্রতিবাদ তেমার কলমে যে প্রতিবাদ জাগিয়েছে তা পড়ে স্তম্ভিত হয়েছি। সে বিষয়ে আরও কথা কয়ে লাভ নেই, সময়েরও অভাব।

তোমার বন্ধু কলকাতায় এলে তাঁকে আমার সঙ্গে দেখা করতে বোলো--- আমাদের অফিসকে বলব তাঁকে পরীক্ষা করে দেখতে। তবে আজকাল আমরা বাঁধা মাইনেতে কাজ দিই না, যে যতটা কাজ করে সে সেই অনুপাতে টাকা পায়।

আশা করি ভালো আছ। ইতি ২৮ নভেম্বর ১৯৫৬

ততদিনে আমার কলকাতায় থাকার এক বছর পূর্ণ হয়েছিল। এর মধ্যে মা শুধু একবার এসেছিলেন সেন্ট্রাল পার্কে তাঁর বাড়ি সম্পূর্ণ হবার পরে আমি কেমন আছি তা সরেজমিনে দেখবার জন্য। মায়ের পক্ষে প্র্যাকটিস ছেড়ে বেশি দিন কলকাতায় থাকা সম্ভব নয়। জলপাইগুড়ি ফিরে যাবার আগে তিনি প্রণবদা - বিজুদির সঙ্গে ব্যবস্থা করে গেলেন যে তাঁরা এই বাড়িতে রান্নাঘরের সঙ্গে লাগোয়া দুটো ঘর নিয়ে থাকবেন এবং আমাকে খেতে দেবেন আরআমি পুব দিকের ঘরটাতে থ

াকব। টানা একটা বছর কলকাতায় কাটিয়ে আমি জলপাইগুড়ি যাবার জন্য তৈরি হলাম। তার আগে দেখা করতে গেল াম সুধীন্দ্রনাথের সঙ্গে।

হাঙ্গারীর ব্যাপার নিয়ে সেই মতান্তরের পরে সুধীন্দ্রনাথের কাছে এই প্রথম যাওয়া। কথায় কথায় তিনি বললেন, সমাজ যদি ন্যায় - অন্যায়ের বিচার না করে ব্যক্তির আত্মপ্রকাশকে গায়ের জোরে দাবিয়ে রাখতে চায় তা হলে মানুষ হিসেবে অ ামার কর্তব্য কী হবে। আলোচনাটা শু হয়েছিল সেবারের পুজো সংখ্যার 'দেশ' -এ প্রকাশিত সুধীন্দ্রনাথের 'মানুষধর্ম', প্রবন্ধটি প্রসঙ্গে। তাঁর কথাবার্তার উপরে হাঙ্গারীর ঘটনাবলির যেন ছায়া পড়েছিল। তার মানে রাজনীতির, কিন্তু তা অ াশুচেতন কবির রাজনীতি। তাঁর কাছে ব্যক্তিস্বরূপ আর ব্যক্তিবাদ একেবারে পৃথক পৃথক জিনিস। সাম্প্রতিক কবিরা যে এই দুটোর পার্থক্য বোঝেন না, বুঝতে চান না এটা নিয়ে সুধীন্দ্রনাথ দুঃখিত। এসব কথার ফাঁকে, কিন্তু ঠিক কোন কথার ফাঁকে মনে নেই, আমি তাঁকে প্রচ্ছন্ন একজিস্টেনশিয়ালিস্ট বলি আর উত্তরে তিনি সুধোন, ইনজিভিজুয়ালিস্টকে আজকাল কমিউনিস্টরা বুঝতে না পেরে একজিস্টেনশিয়ালিস্ট-এর লেবেল লাগিয়ে দিচ্ছে কি না। তারপর তিনি ভেঙে বললেন যে একজিস্টেনশিয়ালিস্ট - কে চেনা মুশকিল, এই দার্শনিকদের মধ্যে এত রকম চিন্তার জটিলতা ও সামঞ্জস্যের অভাব যে একে একটা ফিলোজফিক্যাল সিস্টেম বলা যায় না। এঁদের মধ্যে একান্ত ঈশ্বরবিশ্বাসী কিয়েকের্গার্ডও আছেন, আবার চূড়ান্ত নিরীশ্বরবাদী সাত্রেও আছেন, সকলের লেখাই পড়া উচিত, এমন কী গত শতাব্দীর দস্তয়েভস্কি, নীৎশে প্রভৃতিরও। তবে সবচেয়ে সরলভাবে এটাকে বোঝা যায়, তাঁর মতে, আলবের কাম্যুর 'দ্য মিথ অব সিসিফস' আর 'দ্য প্লেগ' বই দুটো পড়লে। যখন উঠে আসছি তখন নিজেই জিজ্ঞেস করলেন, 'কলকাতায় কাজ খুঁজছিলেন, তোমার সেই বন্ধুর খবর কী?' অ ামি জানলাম, জলপাইগুড়ি গিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা হবে। তাতে তিনি বললেন, 'তাঁকে তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত নিতে বোলো--অ ামি কতদিন এই অফিসে আছি ঠিক নেই। আমি তোমাদের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিয়েছি, আপাতত সপ্তাহে দুদিন।'

জলপাইগুড়ি গিয়ে কমলেশকে সব জানালাম। সে ঠিক করে ফেলল অনিশ্চিত আয়ের ভরসায় কলকাতায়যাওয়ার চেয়ে খড়গপুরে গিয়ে গ্রাজুয়েশনটা সম্পূর্ণ করবে, কলকাতারও কাছে থাকা হবে। আমরা তখন সুধীন্দ্রনাথের গদ্যের চর্চায় মেতে উঠলাম। সেই শান্তিনিকেতনে 'স্বাগত' পড়েছিলাম, তার পর আর তাঁর গদ্য পড়ার সুযোগ পাইনি। যেটুকু তাঁর গদ্যের নমুনা হাতে এসেছিল সেটুকু ছিল 'সংবর্ত', 'অর্কেস্ট্রা' ও 'প্রতিধবনি' কাব্যগ্রন্থগুলির ভূমিকা আর 'ফনের দিবাস্বপ্ন' কবিতাটির ভাষ্য। কিন্তু সেবারকার অর্থাৎ ১৯৫৬-র শরতে তাঁর দুটি প্রবন্ধ বেরিয়েছিল---একটি ছিল 'মনুষ্যধর্ম' আর অন্যটি 'সাহিত্যপত্রে' প্রকাশিত 'অদ্বৈতের অত্যাচার' নামক প্রবন্ধটি। তাঁর সঙ্গে 'মানুষ্যধর্ম' নিয়ে সেদিন সন্ধ্যায় কথাবার্তা হলেও 'সাহিত্যপত্রে' প্রকাশিত প্রবন্ধটি নিয়ে কোনও কথা হয়নি। আসলে 'অদ্বৈতের অত্যাচার' প্রবন্ধটি প্রথম পাঠের সময় আমার কাছে একেবারেই অবগুণ্ঠন উন্মোচন করেনি এবং একাধিকবার না পড়ে যে ওই প্রবন্ধ সম্বন্ধে মন্তব্য করা অনুচিত সে কথা আমি হেসে হেসেই বলেছিলাম তাঁকে। জলপাইগুড়িএসে কমলেশ ও আমি দুজনে মিলে প্রবন্ধটি পড়বার পরেও দুরূহতার আবরণ সারেনি। কেন এই দুরূহতা? তার একটা কারণ এটাও হতে পারে যে কবিতার ভেতরে আবেগ কবিত ার মর্মের দিকে পাঠককে যেভাবে হাত ধরে নিয়ে যায় সেভাবে প্রবন্ধের মধ্যে পরিকীর্ণ উল্লেখ- ও-প্রসঙ্গগুলি পাঠককে সাহ ায্য করে না বরং কোনও কোনও সময়ে সেসবের ভিড়ে দম বন্ধ হয়ে আসে। আর আমার পরস্পরকে শোনাবার জন্য জে ারে জোরে পড়ে এই সত্য আবিষ্কার করলাম যে সুধীন্দ্রনাথের গদ্যেও এক প্রকার ছন্দ আছে যা কানে শুনলে বোঝা যায়, যা তাঁর প্রবন্ধগুলিকে ধবনির উত্থানে পতনে স্পন্দনে বিস্তারে গদ্য কবিতার মতোই এক প্রকাশ শ্রাব্য শিল্পে রূপান্তরিত করেছে। সমস্যা হল বাজারে তাঁর গদ্য রচনার দুষ্প্রাপ্যতা। এবং তার একমাত্র সমাধান হিসেবে 'স্বগত'র প্রকাশ অবিলম্বে হওয়া প্রয়োজন। এসব কথা জানিয়ে তাঁকে উপর্যুপরি দুটি চিঠি লিখলাম আর সেগুলির উত্তর পেলাম কলকাতায় ফিরে এসে। তিনি লিখেছেন,

তোমার জলপাইগুড়ির চিঠির পরে আরও দুখানি পেয়েও জবাব দিতে পারিনি বলে আমি খুবই লজ্জিত আছি। কিন্তু অক াজের চাপ অফুরন্ত, সে জন্য অপরাধ নিও না।

''স্বগত' -এর আধখানা প্রুফ এ পর্যন্ত আমি দেখেছি, কিন্তু এখনও ছাপা অর্ডার দিতে পারিনি। বইখানা কবে বেরোবে তা ভগবান বলতে পারেন---দু তিন মাসের মধ্যে নিশ্চয়ই নয়।

এই অভিজ্ঞতার পরে আরও একটা বড় বই প্রেসে পাঠাতে সাহস হচ্ছে না। তাই আমার প্রবন্ধের দ্বিতীয় খণ্ড এখনও টান

ার মধ্যে বন্ধ রয়েছে। এই লেখাগুলোর অধিকাংশই অসাহিত্যিক অনধিকার চর্চা; এবং এই সিরীজ - এরই অন্তর্গত।
"সাহিত্য পত্রে"র লেখাটা সম্বন্ধে দুরূহতার অভিযোগ একাধিক সমঝদারের মুখে শুনেছি এবং সে অপ্রাঞ্জলতার ব্যাখ্যা আমার অক্ষমতা। অর্থাৎ যে বিশ্বাসের উপরে আমার সাহিত্য বিষয়ক রচনার ভিত্তি, তাই এখানেও ক্রিয়াশীল, এবং সে বিশ্বাস কাব্য বিবেচনার বেলায় যদি বাধা সৃষ্টি না করে, তবে অন্যত্রও তাকে প্রাঞ্জল লাগাই উচিত। সেটা লাগছে না হয়তো আমার রীতি দর্শনালোচনার উপযুক্ত নয় বলে।
সম্প্রতি কোনও নূতন লেখা লিখিনি---না গদ্য, না পদ্য। অতএব রেডিয়োতে নূতন কবিতা পড়ি কি ক'রে।সে দিন আবৃত্তিতে মনও লাগছিল না। তৎসত্ত্বেও "অর্কেষ্ট্রা" পাঠ যে তোমার কাছে একেবারে অশ্রাব্য লাগেনি, সেটা আশার কথা।
আশা করি কুশলে আছ। সময় পেলে একদিন এসো।
ইতি ২২ জানুয়ারী ১৯৫৭
ভবদীয়
সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

বোঝা যাচ্ছে যে ১৯৫৭-র জানুয়ারি মাসে সুধীন্দ্রনাথ রেডিয়োতে একদিন 'অর্কেস্ট্রা' কবিতাটি পাঠ করেছিলেন, বোধহয় পুরোটা নয়, তেমন কিছু-কিছু অংশ যেখানে যেখানে ছন্দের বৈচিত্র রয়েছে। জলপাইগুড়ি থেকে ফিরে আমি অন্নদাশঙ্করের ব্যবস্থাপনায় ডি. এম. লাইব্রেরিতে যোগ দিই। প্রধান কাজ প্রুফ দেখা, তার সঙ্গে বইয়ের প্রোডাকশন ও বিজ্ঞাপন লেখা। ডি. এম. লাইব্রেরি খুব প্রাচীন প্রকাশক, তার স্বত্বাধিকারী গোপালদাস মজুমদারও প্রবীন এবং বইয়ের প্রোডাকশনের ব্যাপারেও উদাসীন। সুতরাং সে ব্যাপারে আমার বিশেষ কিছু করণীয় ছিল না। কিন্তু বিজ্ঞাপনের ব্যাপারে তিনি আমাকে যথেষ্ট স্বাধীনতা দিয়েছিলেন, অন্তত বেশ কিছুদিনের জন্য। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ নাম করা কেউ কেউ গোপালদাকে বিজ্ঞাপনের ভোল পালটাবার জন্য প্রশংসাও করেছিলেন। তখনকার দিনে ডি. এম . লাইব্রেরির প্রধান ব্যবসা ছিল পশ্চিম বাংলা, বিহার ওড়িশা এবং অন্যান্যরাজ্যেও যেসব লাইব্রেরি আছে সেগুলোতে বই সরবরাহ করা। ততদিনে আমার ডাক্তারও আমাকে যথেষ্ট সুস্থ হয়েছিবলে ঘোষণা করেছেন। আমি জলপাইগুড়ি যাওয়ার আগে ড. নন্দী আমার সব পরীক্ষা টরীক্ষা করে মাকে একটাব্যক্তিগত চিঠিতে লিখেছিলেন যে আমার সম্বন্ধে আশঙ্কার আর কিছু নেই, তবে সাবধানে থাকতে হবে। আমিও আগেরচেয়ে ঘন ঘন সুধীন্দ্রনাথের কাছে যাওয়া শু করলাম। চারতলায় ওঠার তখন আর কোনও বিশেষ সমস্যা নেই।
ইতিমধ্যে আমি ডি. এম. লাইব্রেরিকে বলেছিলাম কাম্যুর 'প্লেগ' জোগাড় করে দিতে। কিন্তু কিছুদিন পরে তাঁরা জানালেন যে ও-বই পাওয়া যাচ্ছে না। আমি সুধীন্দ্রনাথকেই বললাম যে 'দ্য প্লেগ' বইটি পড়তে বলেছিলেন কিন্তু সেটি বাজারে নেই, তার তাঁর কপিটি আমাকে দিতে পারবেন কিনা। তিনি কয়েক সেকেন্ড ভেবে জিজ্ঞেস করলেন, 'কবে ফেরত দেবে?' আমি ঠিক কত দিনের কড়ারে তাঁর কাছে থেকে বইটি ধার নিয়েছিলাম তা আজ আর আমার মনে নেই, কিন্তু ঠিক সময়েই যে ফেরত দিয়েছিলাম তা আমার মনে আছে। এর অব্যবহিত পরে নিউ এম্পায়ার -এর উল্টো দিকের বইয়ের দোকানে কাম্যু-র ফল' নামে একটা উপন্যাস পেয়ে কিনে ফেললাম। 'দ্য প্লেগ' পড়েআমি হতবাক। প্রথমটির মতো ঘটনায় ঘটনায় বেগবান কৌতূহলোদ্দীপক দ্বশ্বাস উপন্যাস আমি আর পড়িনি, কিন্তু অন্য উপন্যাসটি নিজের জানা পরিচয়ের আড়ালে অন্য এক অজানা মানুষকে আবিষ্কারের মন্থর কাহিনি। প্লেগেরকাহিনির সঙ্গে আমি নিজের অসুখের ও নিজের ডাক্তারের একটা মিল পাই। ড. নন্দী আমাকে সুস্থ ঘোষণা করে সাবধান করেছিলেন যে হুঁশিয়ার না থাকলে অসুখটা ফিরে আসতে পারে। বই দুটি ভিন্ন ভিন্ন শৈলীতে লেখা হলেও মর্মে যেন এক। প্রত্যক্ষ স্বাস্থ্যের আড়ালে যেমন প্রাণঘাতী অসুখের তেমনই পরিচিত সততার আড়ালে অনাবিষ্কৃত কপটতার গোপন অবস্থান। আমার এই নবজাত উপলব্ধির কথা জানিয়ে চিঠি দিলাম সুধীন্দ্রনাথকে। চিঠির উত্তর না পেয়ে ভাবলাম, তিনি আবার বিদেশ যাত্রা করলেন নাকি! এশীয় সাহিত্য বলে একটা ধারণা গড়ে তোলা যায় কি নাএবং তেমন ধারণার উপরে কোনও পত্রিকা বের করা যায় কি না এসব বিষয়ে খোঁজখবর নেওয়ার জন্য জাকার্তা সিঙ্গাপুর প্রভৃতি জায়গায় যাবার কথা যে তিনি ভাবছিলেন তার কথা একদিন বলেছিলেন। কিন্তু আমার সংশয়ের নিরসন হল এক বিকেলে যাদবপুরে বুদ্ধদেব বসুকে পাশে বসিয়ে তাঁকে গাড়ি চালাতে দেখে। বাড়ি

ফিরেই তাঁকে আবার চিঠি দিলাম। এবার তার উত্তর দিলেন,

তোমার দুখানি চিঠিই যথাসময়ে পেয়েছি। কিন্তু কাজের চাপ কমা দূরের কথা, বেড়েই চলেছে। তাই জবাব দিতে পারিনি এতদিন; এবং এখনও প্রাপ্তি স্বীকার করার বেশী সময় হাতে নেই।

দক্ষিণ - পূর্ব এশিয়ায় ইনফ্লুয়েঞ্জা সংক্রামক - রূপে দেখা দিয়েছে ব'লে, সে - অঞ্চলে আমার ভ্রমণ উপস্থিত বন্ধ ক'রে দিতে হল। আমেরিকা যাওয়ার আগে ও-দিকে ঘুরে আসতে পারব কি না বলা শক্ত। না পারলে সেপ্টেম্বরের শু পর্যন্ত দেশে আছি।

আশা করছি তার আগেই বই দুখানা বেরিয়ে যাবে। স্বগত নাকি ছাপা শু হয়েছে; অন্যখানার ফর্মা - সাতের প্রুফ বাকী। সুতুরাং অন্য কিছু লেখার সময় এখনও আসেনি।

কাম্যু-র বই তোমাকে অভিভূত করেছে জেনে খুব খুশী হলুম; আরও খুশী হতুম তাঁর প্রভাবে যদি তোমারভাববিলাসী অ াশাবাদ চিড় খেত। তবে প্রত্যাশার মধ্যে ফাঁকি কোথায় তা ধরতে পারার বয়স এখন তোমার হয়নি। তাই তোমার সম্বন্ধে আজও আমি হতাশ নই।

আশা করি কুশলে আছ। ইতি ২০ মে ১৯৫৭

এই সময় সুধীন্দ্রনাথ স্থির করেছিলেন এক বছরের জন্য শিকাগো ৰিবিদ্যালয়ে ভিজিটিং প্রফেসর যোগ দিতে আমেরিকা য াবেন। আমেরিকা তাঁর দেখা দেশ না হলেও অজানা পৃথিবী নয়। নিজেকে তাঁর নাকি কাফ্কার মতো লাগছিল। ফ্রানৎস কাফ্কা আমেরিকায় না গিয়েও 'আমেরিকা' উপন্যাসটি লিখেছিলেন। শান্তিনিকেতনে পড়ার সময়ই আমি কাফ্কার 'দ্য ক্যাসল', 'দ্য ট্রায়াল', 'দ্য গ্রেট ওয়াল অব চায়না' পড়েছিলাম এবং পড়ে গভীরভাবেআচ্ছন্ন বোধ করেছিলাম। কাফ্কার প্রতি আমার দুর্বলতার আর একটা কারণ হল আমার মতো তাঁরও যক্ষ্মা হয়েছিল। তাঁর ছিল হিউম্যান সিচুয়েশনকে তথ া মানবিক পরিস্থিতিতে একই সঙ্গে রূপকের আকারে আর যথাস্থিত রূপেউপস্থাপনের প্রতিভা। কাফ্কা থেকে কী ভাবে যেন টোমাস মানকে ছুঁয়ে গ্যোটের কথা এসে গেল। আমি মান-এর 'হটে ইন ভাইমার' পড়িনি শুনে তিনি বললেন, 'তুমি এত গ্যেটেভক্ত, কিন্তু লটে ইন ভাইমার পড়োনি?' সেদিন তিনি সাহিত্য নিয়ে আলোচনার মেজাজে ছিলেন। আরও বললেন যে গ্যেটে অনেক খেটে অনেক সাধনা করে তাঁর যে বিপুল খ্যাতি - প্রতিপত্তি তৈরি করেছিলেন তাতেই তিনি জনসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন ও নিঃসঙ্গ হয়ে যান, যে নিজের সৃষ্টি এক কারাগারে নিজেই বন্দি। তাঁর সেই একাকী বিযুক্ত অস্তিত্বের যন্ত্রণা ও ব াস্তবতাকে মান উপন্যাসটিতে ৰিষেণ করেছেন। তার পর সুধীন্দ্রনাথ যোগ করলেন, একই ব্যাপার ঘটে রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও। তাঁর পরিকররাই তাঁকে ঘিরে থাকতেন পরিখার মতো। তাঁর নিঃসঙ্গতা ছিল তাঁরই সৃষ্টি, তাঁরই খ্যাতির পরিণ াম।

সুধীন্দ্রনাথের কি আশঙ্কা ছিল যে তাঁরও গ্যেটে - রবীন্দ্রনাথের মতো একা - একা বাস করার দশা হতে পারে? তিনি একক ালে উত্তর কলকাতার পৈতৃক আশ্রয় ছেড়ে, পুরনো বন্ধুদের অনেককে বর্জন করে বাঙালি সমাজের থেকে দূরে চলে গেছলেন আর বাঙালি পাঠক সমাজও অনেকটাই ভুলে গিয়েছিল তাঁকে। তারপর তিনি গিয়ে উঠলেন সাহেবপাড়ায় দুর ারোহ ফ্ল্যাটে। অন্নদাশঙ্কর রায়ের সাক্ষ্য থেকে জানতে পাই যে এই সময় তিনি একদিন সুধীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে গেলে তিনি অন্নদাশঙ্করকে বসতে না বলে কয়েকজন ইউরোপীয় পোশাক পরিহিত ব্যক্তির সঙ্গে বেরিয়ে যান। তাঁর কোনও বইও মধ্যের বারো - তেরো বছরে বেরোয় নি, যদিও দু - তিনটে কবিতা লিখেছিলেন। আবার ১৯৫১-৫২ সালে তাঁর ব াঙালি সমাজে ফিরে আসা শু হয়। অধিকাংশ কথাই ইংরেজিতে বলতেন,বরাবরই। কিন্তু তা সত্ত্বেও পঞ্চাশের দশকে পৌঁছে তিনি পুরনো লেখার সংস্কার সাধনের পাশাপাশি শু করলেন নতুন লেখালেখিও। অফিসের সাহেব থেকে হলেন ছ াত্রছাত্রীর প্রিয় মাস্টারমশায়। তাঁর বারান্দায় আড্ডা জমাতে জড়ো া হল এক ঝাঁক উজ্জ্বল তণ-তণী। আর - একদিন তিনি যাদবপুর ৰিবিদ্যালয়ের ছাত্র - ছাত্রীদের নিয়ে আলোচনায় মেতে উঠলেন। প্রত্যেকেই খুব ভালো, প্রত্যেকেই পড়ার বিষয়টাকে খুব ভালোবাসে। একজন গণিতের ছাত্র থেকে তুলনামূলক সাহিত্যের ছাত্র হয়েছে, কিন্তু তার যেমন অসাধারণ পারসেপশন তেমনই উন্নত সেনসিবিলিটি। তার নাম অমিয় দেব, তাকেই তাঁর সবচেয়ে পছন্দ। তবে প্রায় সব ছাত্র - ছ াত্রীই অসাধারণ।

তারপর কী ভেবে বললেন, 'তুমি তো এখন সুস্থ হয়েছ, তোমার বাড়িও যাদবপুরে, বাড়ির কাছেই ৰিবিদ্যালয়। এমন

একটা সুযোগ তোমার হাত ছাড়া করা উচিত নয়। তুমি ওখানে আবার পড়া শু করো।’ আমি বললাম, ‘আমি তো কলক াতা ৱিবিদ্যালয় থেকে ইতিহাস পড়তে পড়তে চলে গেছলাম।’ তিনি বললেন যে যাদবপুরেও লিভিং লেজেণ্ড সুশোভন সরকার আছেন। তাঁর কাছে পড়া একটা মহা সৌভাগ্য। কিন্তু আমি তখন ডি. এম. লাইব্রেরির কাজ নিয়ে যথেষ্ট সন্তুষ্ট। অনেক সাহিত্যিকের সঙ্গে আলাপ হচ্ছে, প্রশংসাও পাচ্ছি অনেকের কাছ থেকে, পুস্তক প্রকাশার্থী অনেক লেখকের কাছে খ াতিরও পাচ্ছি, অনেকে আবার তাঁদের পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের জন্য আমারপেছনে ঘুরছেন। আমি এখন ছাত্র হলে কে পুঁছবে আমায়? তার উপরে আমার মাথায় ঘুরছে ডি. এম. লাইব্রেরির মতো ঐতিহ্য সম্পন্ন প্রকাশকের ঘর থেকে আম ার উপন্যাস প্রকাশের অাশ্বাস। সুকুমার সেন প্রণীত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে গ্রন্থকার লিখেছেন যে কল্লোল যুগের অনেক সাহিত্যিকই ডি. এম. লাইব্রেরির দৌলতে সাহিত্যিক খ্যাতি পান। তা হলে আমিই বা পাব না কেন? আর তা হলে সুধীন্দ্রনাথের কথাকে আমল দেবার দরকাই বা কী? তিনি নিজে এখন যাদবপুরের ছাত্রদের নিয়ে বেজায় উৎসাহিত, তাই আমাকেও যাদবপুরের ছাত্র হিসেবে দেখবার জন্য উৎসুক। আমি তাঁর কথাতে বিশেষ আমল দেওয়ার কারণ দেখলাম ন া।

আর - একদিন বিকেলে গেছি। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছি, আর সুধীন্দ্রনাথ সমবয়সী একজনের সঙ্গে ধুপধুপ করে নামছেন। সিঁড়ির মাঝখানে দেখা। আমিও তাঁদের সঙ্গে নেমে এলাম। আলাপ করিয়ে দিলেন সঙ্গীর সঙ্গে। কোনও একজন মহল ানবিশ, কিন্তু নামটা আমি ঠিক ধরতে পারিনি, তবে নিজেকে তাঁকে সম্ভাষণ করছিলেন বাবলু নামে। আমার পরিচয় দিলেন ‘হিয়ার ইজ এ ব্রাইট ইয়ং ম্যান’ বলে। তারপর জানতে চাইলেন, আমি কোথায় যাব। আমি তো ওঁর কাছেই যাব বলে এসেছিলাম। এবার তাহলে কোথায় যাব ভাবতে লাগলাম। তিনি আমার ভাবনাকেসহজ করে দিয়ে বললেন, ‘আমর া যাচ্ছি টালিগঞ্জ ক্লাবে, তোমাকে একটু এগিয়ে দিতে পারি।’ সে কথা শুনে আমি যাদবপুরে বাড়ি ফেরাটাই ঠিক করল াম। ভেবেছিলাম তিনি হয়তো সোজা দক্ষিণ দিকে গিয়ে রাসবিহারী অ্যাভনিউর মোড়ে আমাকে নামিয়ে দেবেন, ওঁরা দুজনে সামনে বসলেন, আমি পেছনে। রাসেল স্ট্রিট থেকে বেরিয়ে মিডলটন স্ট্রিট দিয়ে ক্যামাক স্ট্রিটে পৌঁছে লোয়ার স ার্কুলার দিয়ে বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে ঢুকলেন। আমি ভাবছি যে, উনি বললেন টালিগঞ্জ ক্লাবে যাবেন, কিন্তু যাচ্ছেন গড়িয়াহাটা মোড়ের দিকে। সামনে বসে ওঁরা দুজনে কোনও একটামামলা - মোকদ্দমা নিয়ে কথা বলে চলছেন। তাঁদের কথায় একটু বিরতির ফাঁকে সুধীন্দ্রনাথ আবার আমার যাবদপুরেএম. এ. ক্লাসে ভর্তি হয়েছি কি না জিজ্ঞেস করলেন। আ মি বোধহয় মাঝ সেসনে ভর্তি হওয়ার সমস্যা দেখিয়ে ব্যাপারটা চাপা দিতে চাইলাম। তখন তিনি আমাকে সরাসরি সুশে াভনবাবুর বাড়ি গিয়ে কথা বলতে বলে পাশের সঙ্গীকে বলেন আমাকে এলগিন রোডে সুশোভনের বাড়িটা বুঝিয়ে দিতে। বাবলু নামে সেই সঙ্গী আমাকে বুঝিয়ে দিলেন একেবারে এদিকে তাঁর গাড়ি চলেছে সোজা, আমার অজানা কোনও গন্তব্য অভিমুখে। শেষ পর্যন্ত গোল পার্কে আমাকেনামিয়ে দিয়ে বললেন, ‘আমার আর লেভেল ক্রসিংটার পরীক্ষা দিতে সাহস হচ্ছে না।’ তখন পর্যন্ত গড়িয়াহাট - ঢাকুরিয়া ব্রিজটা হয় নি, লেভেল ক্রসিং পেরিয়ে ঢাকুরিয়া - যাদবপুরে অ াসতে হত এবং এক - এক সময় তার বন্ধগেটে একঘেয়ে টং টং আওয়াজ ছিল একটা দুঃস্বপ্ন। গোলপার্কে আমায় নামিয়ে তিনি সাদার্ন অ্যাভেনিউ দিয়েতাঁর গন্তব্যের অভিমুখে চলে গেলেন।

আমার আর বাঁচার পথ ছিল না। যেতেই হলো লিভিং লেজেণ্ড সুশোভন সরকারের বাড়িতে। কিন্তু প্রফেসর সরকার বাঁ চিয়ে দিলেন। বললেন, এ - বছরের পক্ষে অনেক দেরি হয়ে গেছে, মাঝখানে তিন বছর ক্লাস না করারপরে এখন দেরিতে ক্লাস শু করে মেক - আপ করা খুবই কঠিন, বরং সামনের বার একেবারে গোড়া থেকে ক্লাস করতে। তখনকার মতো বেঁচে গেলাম। পরের দিনই খবরটা দিতে গেলাম সুধীন্দ্রনাথকে। কোনও কারণে সেটা একটা ছুটির দিন ছিল। জানতাম যে বিকেল - সন্ধের দিকে ছাড়া ওঁর কাছে যাওয়া উনি পছন্দ করেন না। কিন্তু এখন হয়তো যাদবপুরে পড়ানোর ফলে তিনি সকালেও অতিথিকে গ্রহণ করতে পারেন। করলেনও তাই নিজেই দরজা খুলে। খুশিও হলেন আর সেটা মুখেও বললেন, ‘আজকেই সকালে এসে খুব ভালো করেছ।’ এরকম সম্ভাষণে অবাকই হলাম। সন্ধের দিকে এলে দক্ষিণের বারান্দায় বসি। সেদিন সকালে গিয়ে বসলাম বসবার ঘরে। দেওয়াল ঘেঁষে রাখাছিল মস্ত রেডিয়োগ্রাম, তার পাশে এটা শ্রীনিকেতনী মে াড়া। আমার বসবার জন্য সোফা দেখিয়ে দিয়ে নিজে বসলেন মোড়াটাতে। রেডিয়োগ্রামটায় জড়ানো জড়ানো আওয়াজ চলছিল। অপ্রস্তুত-ভাবে হেসে বললেন, ‘এখনই রাজ্যেরীর গান হবে।’ তারপর মোড়ায় বসা অবস্থায় আওয়াজটা স্পষ্ট

করে দিলেন। সুধীন্দ্রনাথ মানুষটা ছিলেন খুবই ঝকঝকে, সর্বদাই সপ্রতিভ। কিন্তু সেদিন তাঁর অন্য রূপ দেখলাম। একটু পরেই বেতারে ঘোষণা হল পরবর্তী অনুষ্ঠানের। বাজনা শু হলে আওয়াটাকে ঠিক পর্দায় বেঁধে দিয়ে রেডিয়োগ্রামের প াশে রাখা সেটিতে গিয়ে বসলেন হাতলেরউপর কনুই আর বদ্ধ মুঠি গালে রেখে, কিন্তু চোখ দুটি বোজা। রাজেশ্বরী বে াধহয় তিনটে গান গাইলেন। 'ফুল বলে ধন্য আমি', আর একটি কোন্ গান মনে নেই, শেষেরটি ছিল 'এ কী কণা'। আমি মধ্যে মধ্যে চোখ তুলে দেখছিলাম তন্ময় শ্রোতা সুধীন্দ্রনাথকে। গান শেষ হলে তিনি প্রথমে বললেন, ফুল বলে ধন্য আমি গ ানটা তাঁর খুব প্রিয়, তারপর সগর্বে বললেন, দুপুরে রাজেশ্বরী ভজন গাইবেন, রাতে ঠুংরিও গাইবেন। আমেরিকা-যাত্রার আগে এটাইতাঁর শেষ রেডিয়ো প্রোগ্রাম। সুশোভনবাবুর সঙ্গে কী কথা হয়েছে তা জানালে তিনি বললেন, 'আমি থাকব ন া দেশে, কিন্তু সামনের বছর যেন নিজে থেকেই ভর্তি হয়ে যেয়ো।' সুধীন্দ্রনাথ সচেতন ছিলেন যে কাগজে কলমে তাঁর এম.এ. ক্লাসে পড়ানোর কথা নয়। সে - ব্যবস্থাতে তিনি পড়াতেন সেটা ছিল একটা বিশেষ ব্যতিক্রম এবং বিভাগীয় প্রধান বুদ্ধদেব বসুর অনুগ্রহ। কিন্তু নিন্দুকরা বলত এটা সম্ভব হয়েছিল রাজা সুবোধ চন্দ্র বসু মল্লিক তাঁর প্রমাতামহ ছিলেন হলে। তবে জ্ঞানে ও গুণে, আভিজাত্যে ও পাণ্ডিত্যে, ভদ্রাচরণে ও মহানুভবতায় সুধীন্দ্রনাথের মতো ব্যক্তিত্ব খুবই দুর্লভ। ত াঁর দৃষ্টান্তের পুনরাবৃত্তির কোনও সম্ভাবনা নেই।

যেমন সুধীন্দ্রনাথের তেমনই রাজেশ্বরীরও অসাধারণ আকর্ষণী শক্তি ছিল ---রূপে, গুণে, বাচনে ও হার্দিক ব্যবহারে। বিশ্বভ ারতীর সংগীত ছাত্রী ছিলেন তিনি। কিন্তু তাঁকে বিয়ের পরে সুধীন্দ্রনাথও আর শান্তিনিকেতনে যাননি। তাঁদের বিয়েটা অনেকেরই অপছন্দ ছিল হয়তো সেজন্যই তিপ্পান্ন সালে যখন শান্তিনিকেতনে সাহিত্যমেলা হয় তখনও তাঁর পক্ষে যোগ দেওয়া সম্ভব নয় বলেছিলেন। অনেকের অনেক বিরূপতা ডিঙিয়ে রাজেশ্বরী তখনকার একজন প্রধান সংগীত শিল্পী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। নিয়মিত শাস্ত্রীয় সংগীত শিক্ষা করতেন বিষ্ণুপুরী ঘরানার মূল ধারক রমেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে এসরাজে সংগত করার জন্য গোপেশ্বরবন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে এসরাজে সংগত করার জন্য গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপর পুত্র অশেষ বন্দ্যোপাধ্যায়কে শান্তিনিকেতন থেকে আনিয়ে নিতেন রাজেশ্বরী। আবু সয়ীদ আইয়ুব ও গৌরী দত্তের মধ্যে যেমন পঁচিশ বছরের ব্যবধান ছিল তেমনই সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও র াজেশ্বরী বাসুদেবের মধ্যে ছিল বিশ বছরের ব্যবধান।অর্থাৎ সুধীন্দ্রনাথের মৃত্যুর সময় রাজেশ্বরীর মাত্র বছর চল্লিশেক বয়স। সুধীন্দ্রনাথ যেমন সাহিত্যের ব্যাপারে পারফেক্শনিস্ট তেমনই রাজেশ্বরীও গানের ব্যাপারে পারফেক্শনিস্ট ছিলেন। আমার মনে আছে, ডি. এম. লাইব্রেরিতে একবার সিন্ধ্রি ফার্টিলাইজার কোম্পানির কালচরাল অ্যাসোসিয়েশনের এক কর্তা ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ হয়। তাঁরা ডি. এম. থেকে বই কিনতে আসতেন। তিনি গজগজ করে বললেন, রাজেশ্বরী দত্ত আর শা ন্তিদেব ঘোষকে তাঁরা বিজয়াসম্মিলনীর অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ করতে গেছলেন, শুনিয়ে দিলেন আমেরিকায় দু বছর গানের ঠিকমতো রেওয়াজ করতে পারেন নি অর্থাৎ মার্কিন ডলার তাঁর অনেক আছে ইন্ডিয়ান পির দরকার নেই। আমি র াজেশ্বরীর পক্ষে কথা বলতে গেলাম, গোপালবাবু মাঝপথেই থামিয়ে দিলেন। হাজার হোক, খদ্দের তো! যথেষ্ট রেওয়াজ ছ াড়া কোনও বড়ো গুণী যে সভায় বসতে পারেন না এ-কথা তাঁর মাথায় ঢোকেনি।

সিন্ধ্রির কালচরাল অ্যাসোসিয়েশন যে রাজেশ্বরীকে চেয়েছিল বিজয়া সম্মিলনীতে এই ঘটনা থেকে বোঝা যায় তাঁর কতখা নি খ্যাতি ছিল। এমন প্রতিভাময়ী শিল্পীর বাংলার সংগীত জগৎ থেকে অকাল অপসরন হয় সুধীন্দ্রনাথের অকাল মৃত্যুতে। তার আগে তাঁদের আমেরিকাবাসের কালে দু বছরের জন্য রাজেশ্বরী ওই জগতে অনুপস্থিত ছিলেন। ফিরে এসেও তিনি ঠিকমতো সংগীত সাধনা করতে পারেন নি। এখন যেখানে বিরাট জীবনদীপ বাড়িটা দাঁড়িয়ে সেখানে তখন রাতেও আলো জ্বেলে বাড়িটা তৈরির কাজ চলছিল। একদিন গেছি, বললেন, সারা রাত এত আওয়াজ হয়েছে যে ঘুমোতে পারেন নি। চব্বিশ ঘন্টা ধরে বাড়ি তৈরির আওয়াজ এড়াতে তখন রাজেশ্বরী প্রায়ই সকালে রমেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে যেতেন।

সুধীন্দ্রনাথের মৃত্যুকে অকাল মৃত্যু বলেছি। নানা অর্থেই মৃত্যুটা ছিল শোচনীয়। আমেরিকা থেকে ফিরে তিনি নতুন উৎস াহে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো শু করেন। ছাত্ররা প্রায়ই আসেন তাঁর বাড়িতে। তা ছাড়া নবীনকবি - সাহিত্যিকরাও সাহিত্যে প্রত্যাবৃত্ত সুধীন্দ্রনাথের বারান্দায় ভিড় জমান। একদিন গিয়ে কাজের লোকের মুখে শুনি, স্নানে গেছেন। চলে অ াসছিলাম, হঠাৎ রাজেশ্বরী বেরিয়ে এসে আমাকে দেখে বসতে বললেন। বারান্দায় গিয়েবসেছি। বসেই আছি। কিছুক্ষণ পরে কোমরে তোয়ালে জড়িয়ে স্বয়ং সুধীন্দ্রনাথের আবির্ভাব। দেরির জন্য দুঃখ প্রকাশকরে বললেন যে তৈরি হয়ে অ

াসছেন। তখন দেখলাম, শিরে কেশের স্বল্পতা সত্ত্বেও গ্রিক দেবতা অ্যাপোলোর মতো তাঁর সুঠাম দেহের সৌন্দর্য ও স্বাস্থ্য, তাঁর অঙ্গ সৌষ্ঠব দেখে তাঁকে যথেষ্ট বলবান পুষ বলেই মনে হয়। সেদিন তিনি বেশ উৎসাহের সঙ্গেই বলেছিলেন, কয়েকজন তণ কবি এসে তাঁর সঙ্গে সাহিত্য আলোচনা করেই ক্ষান্ত হয় নি, রাজেশ্বরীর গান শোনারও দাবি করেছিল। তণ - তণীর আসা - যাওয়াতে, তাদের সংস্পর্শে সুধীন্দ্রনাথও যেন একটু একটু করে তণ হয়ে যাচ্ছিলেন। এই কথা তাঁকে বলাতে তিনি হেসে বললেন, 'এটা তো স্বাভাবিকই।' আর রাজেশ্বরী টিপ্পনি কাটলেন, 'তণী ছাত্রীদের দেখাবার জন্য নতুন গাড়িও কিনেছে।

সেই নতুন গাড়িটা দেখার সৌভাগ্য হলো ১৯৬০ -এর ১০ এপ্রিল। তারিখটা মনে আছে একটা বিশেষ কারণে।

ইতিমধ্যে আমার প্রথম উপন্যাস 'একই সমুদ্র' বেরিয়েছিল ডি. এম. লাইব্রেরী থেকে। এক কপি উপহার দিয়েছিলাম মণীন্দ্রলাল বসুকে। 'রমলা' উপন্যাসের জন্য তিনি খুবই বিখ্যাত ছিলেন, 'জীবনায়ন,' 'সহযাত্রিণী' প্রভৃতি আরও কয়েকখানা উপন্যাস লিখেছিলেন এবং তাঁর 'দার্জিলিঙে'ও বাংলা ছোটগল্পের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, আর তাঁর 'সুকান্ত' গল্পের নায়কের নাম অনুসারেই কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের নামকরণ হয়। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে রোমান্টিসিজমকে তিনি একাই বাংলা সাহিত্যে একটি আন্দোলনের রূপ দিয়েছিলেন। আর তাঁর ছিল বিশাল গ্রন্থাগার, তাতে ছিল টোমাস মান, রম্যা রলাঁ, আঁদ্রে জিদ প্রমুখের তাঁকে নিজে লিখে উপহার করা বই। এইসব বিশ্ববিখ্যাতসাহিত্যিক যাঁকে বই উপহার করেছিলেন তাঁকে আমিও এক কপি 'একই সমুদ্র' উপহার করেছিলাম। একদিন তাঁর উত্তরও পেলাম। পোস্টমার্ক অনুসারে পেলাম ৭ এপ্রিল তারিখে।

তিনি লিখেছেন,

কল্যাণীয়েষু সুরজিৎ,

তোমার বই পড়ে ভালো লাগলো। এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে দেখা হলে আলোচনা করবো। আগামী রবিবার 10th April, at 1 P.M. P.E.N. Annual lunch হবে। তুমি নিশ্চয় আসবে, আমার ঋব্ভন্দ্বব্দব্ধ.

Lunch হবে at National High School Hall 164 Lansdown Road. গীতা ভবনের উত্তরে বাড়ী, সুধীর সরকারের বাড়ীর উল্টো দিকে। তুমি ১টায় আসবে নিশ্চয়।

আশা করি সব মঙ্গল

ইতি

মণীন্দ্রলাল বসু

এখানে জানিয়ে রাখি সাহিত্যিকদের আন্তর্জাতিক সংস্থা পি. ই. এন - এর পশ্চিমবঙ্গে একটা বিশেষ শাখাখোলার কাজ তাঁরই উদ্যোগে সম্পন্ন হয়েছিল। কাছের মানুষদের সম্বন্ধে স্মৃতিকথায় অন্নদাশঙ্কর লিখেছেন যে মণীন্দ্রলাল ছিলেন পশ্চিমবঙ্গে পি. ই. এন - এর 'প্রাণপুষ'। যা হোক নির্দিষ্ট দিনে ক্ষণে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে যাই। আমি আসি দেশপ্রিয় পার্কের দিক থেকে আর বাস থেকে নামি পশ্চিমের ফুটপাতে। ঠিক তখনই হাজরা রোডের দিকথেকে আসেন সুধীন্দ্রনাথ, একাই আসেন, তাঁর নতুন গাড়িতে। গাড়ি থেকে নেমে চাবি লাগিয়ে পুবে ফুটপাতে উঠে গাড়ির বাঁ দিকের দরজা দুটো টেনে দেখতে গিয়ে উল্টো দিকের ফুটপাতে আমাকে দেখে হাত নাড়লেন। হাত নেড়েচলে গেলেন না, ওই রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে রইলেন। আমি রাস্তা পেরিয়ে তাঁর কাছে গিয়ে নমস্কার করলেন সুধীন্দ্রনাথ হেসে বললেন, 'এত জেফের নিয়ে খুঁজছি, কালবৈশাখীর দেখা নেই।' তখন আমি খেয়াল করে দেখলাম তাঁর গাড়িটার নাম Zephyr জেফের। নামটা মনের মধ্যে ভালো করে লিখে রেখে বললাম, 'আজ ঝড় হবে মনে হচ্ছে।' তিনি ফুটপাতে দাঁড়িয়েমাথার ওপরকার আকাশটা ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে বললেন, 'আমি তো কোনও চিহ্ন দেখছি না।' এই বলে ভেতরে যাবার জন্য ডাকলেন, 'আচ্ছা, চলো ভেতরে যাই।' তারপরেই ষড়যন্ত্র করার মতো নিচু গলায় একেবারে সাদা বাংলায় সাবধান করলেন, 'কাজের বাড়িতে খবরদার জল খাবে না। যে - জগটা ড্রামে ডুবিয়ে জল তোলা হচ্ছে সেটাই পরে যেখানে - সেখানে নামিয়ে রাখা হচ্ছে, আবার জলের ড্রামে ডোবানো হচ্ছে। তেমন তেষ্টা পেলে ফেরার পথে লেমোনেড - টেমোনেড কিনে খাবে।' তাঁর এই বারণটা আমি আজও ভুলিনি। যেমন ভুলিনি একবার প্রেমেন্দ্র মিত্রের বাড়িতে থাকাকালে বৌদির শিক্ষা যে খাওয়ার আগে বা খেতে খেতে জল খাবে না, খাবে খাওয়ার কিছুক্ষণ পরে।তবে সেদিন কালবৈশাখীর বিষয়ে আমার কথাটাই ঠিক হয়েছিল।

সন্ধের পর শু হয় ঝড়ের তাণ্ডব। ততক্ষণে ডিকশনারি খুলে দেখেছি যে জেফের কথাটার অর্থ পশ্চিমের তুফান। তাঁকে একট া পোস্টকার্ড লিখি। বোধহয় এই রকমই কিছু লিখেছিলাম দেখলেন তো, আজই Zephyr -এ চড়ে কালবৈশাখী এল কি ন া!

যতদূর মনে পড়ে, পি. ই. এন-এর সেই লাঞ্চের পরে সুধীন্দ্রনাথের সঙ্গে আর দুবার মাত্র দেখা হয়েছিল। এম. এ. পরীক্ষ াটা ড্রপ করেছিলাম বলে তাঁকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলছিলাম। তবু একদিন তার ফ্ল্যাটে গেছলাম। 'উত্তরসূরী'র সম্পাদক, কবি ও সংগীতজ্ঞ অণ ভট্টাচার্যের সঙ্গে, যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যা হয়। দু-একটা কথার পরেই আমার পরীক্ষার কথা জিজ্ঞেস করলেন। প্রস্তুতি হয়নি বলে পরীক্ষাটা দিইনি শুনে ভারী গলায় বললেন, 'অ্যাবসোলিউটলি আনপ ার্ডনেবল।' অণদাও তাঁর কথায় সায় দিলেন। তখন সুধীন্দ্রনাথ বললেন, 'যেটা শু করবে সেটা শেষ করবে।' আমি দেখল াম, এখানে চুপ করে থাকাটাই বুদ্ধির কাজ। তারপর অণদার সঙ্গে কথার ছলে ফিরে এলেন স্বাভাবিক কথাবার্তায়। বললেন, ইংরেজিতে আত্মজীবনী লেখা শেষ করে বাংলা কবিতার শব্দ নিয়েকিছু কাজ করার ইচ্ছে আছে। পরিষ্কারবাংল ায় বললেন, 'শব্দের যেমন রূপ আছে তেমনই রং আছে, যেমন ধ্বনি আছে তেমনই ধ্যান আছে।' কিন্তু অভিধানের অন্তর্গত শব্দের অন্তর্গূঢ় অভিলাষ নিয়ে কী রকম কবিতা লেখার কথা তিনি ভেবেছিলেন তা আমরা আর জানতে পারব ন া। তার আগেই তাঁকে চলে যেতে হল।

পরের বার অথবা শেষ দেখা কফি হাউসের ওপর তলায়। শিবনারায়ণ রায়ের নেতৃত্বে র‍্যাডিকাল হিউম্যানিস্টরা তাঁর জন্য আলোচনা ও কবিতা পাঠের একটা ঘরোয়া সভা ডেকেছিলেন ৪ জুনের বিকেলে। ভীষণ গুমোট গরম ছিল মনে অ াছে কিন্তু তারিখটা মনে ছিল না। তাঁর মৃত্যুর পরে ২৮ আগস্ট ১৯৬০ -এর 'দ্য র‍্যাডিকাল হিউম্যানিস্ট' পত্রিকায় সুধীন্দ্রনাথ স্মৃতি - সংখ্যায় শিবনারায়ণ রায়ের লেখাতে তারিখটা আছে। সেদিন ঘরটা একেবারে ভিড়ে ঠাসা ছিল। তাঁর এত অনুরাগী আছে দেখে তিনি বোধহয় খুশিই হলেন। এক - একজন তাঁকে এক - একটা কবিতা পড়ার জন্য বলছিলেন। আমি বললাম 'উটপাখী' পড়তে। তিনি বললেন, একটাই পড়বেন---'অর্কেস্ট্রা', পুরো কবিতাটি। পড়তে পড়তে কবিতার ছন্দের সঙ্গে নিজেও দুলছিলেন মধ্যে মধ্যে। কার্তিকদাকেও সঙ্গে নিয়ে গেছলাম।সবার শেষে গিয়ে বললাম, 'অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা হলো---পুরোটা তো একেবারে শুনিনি আগে।' তিনি হেসে বললেন, 'একদিন এসো, তুমি না এলে বোধহয় বর্ষ া আসবে না।' তারপর কার্তিকদাকে দেখিয়ে বললেন, 'তোমার বন্ধুটিকেও নিয়ে আসবে।' মনে আছে সেদিন পরনে তাঁর সাদা প্যান্ট - শার্ট ছিল।

বেশ কয়েকদিন পরে এক সকালে কার্তিকদা এসে হাজির। বললেন, 'চলো, আজ সুধীন দত্তর বাড়ি যাব।'আমি বললাম, 'উনি সন্ধের দিকে ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় গল্প করতে ভালোবাসেন। আজ দিনটা এখানেই থাকুন, ঘুমোন, আমরা সন্ধেতে যাব।' ততদিনে প্রণবদার কর্মস্থল জেসপে যেতে আসতে অসুবিধে হচ্ছিল বলে ওঁরা এ বাড়ি ছেড়ে হিন্দুস্তান পার্কে চলে গেছেন। দিদিমার তদারকিতে আমার রান্নাবান্না ও অন্যান্য কাজ করার জন্য বিভূতি গান্ধী নামে একজন ওড়িয়া পরিচারক ছিল। দুজনের জন্য রান্নার কথা বলে কার্তিকদাকে বললাম, 'চলুন, ততক্ষণ কাঞ্চুদার বাড়ি ঘুরে আসি।' কাঞ্চুদা মানে অচিন্ত্যেশ ঘোষ যাদবপুরেই থাকতেন, লিখতেন সমাজতত্ত্ব বিষয়ক প্রবন্ধ। কার্তিকদাকে রেডিয়োটা খুলে দিয়ে তৈরি হচ্ছি আমি বেরোব বলে। হঠাৎ রেডিয়োতে সুধীন্দ্রনাথের মৃত্যু সংবাদ। আমরা স্তম্ভিত। তখনই বেরিয়ে পড়লাম। চোখের স ামনে বারবার ভেসে উঠছিল তাঁর সেই সাদা প্যান্ট - শার্ট পরা চেহারা, মুখেচোখে হাসি। রাসেল স্ট্রিটের বাড়ি তখন গিজগিজ করছে। সেখানে কিছুক্ষণ কাটিয়ে ফিরে এলাম বাড়িতে। খেয়েদেয়ে এবার কেওড়াতলা শ্মশানে। শবদেহ আসার আগেই এলেন সত্যেন বোস। একটু পরে যাদবপুরের ছাত্রছাত্রী বাহিনী বাহিত হয়ে সুধীন্দ্রনাথও এসে পড়লেন। সাবধানে নামানো হল তাঁকে। সত্যেন বোস এগিয়ে গেলে সবাইপথ ছেড়ে দিলেন তাঁকে। ভিড় থেকে বেরিয়ে এসে বসলেন পামগ াছগুলির ছায়ায় একটা বেঞ্চে, বজ্রাহতের মতো বসেইথাকলেন। একদা ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন দুজনে। তাঁকেই 'অর্কেস্ট্রা' উৎসর্গ করা হয়েছিল। তারপর সুধীন্দ্রনাথের দ্বিতীয়বিয়ে নিয়ে বন্ধুচ্ছেদ। আবার একজনের মৃত্যু অপরজনকে টেনে অ ানল এই শ্মশান চত্বরে অন্তিম অগ্নির মহাশুদ্ধিকরণের নিদাণ লগ্নে।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com